পুঁজিতন্ত্রে

আমরা যে সমাজে বাস করছি তা হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ।এই সমাজে মানুষের চেয়ে পুঁজি বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও অধিকতর ক্ষমতাবান। এখানে মানুষ মানুষকে শাসন করছে এমনটা দৃশ্যমান হলেও বাস্তব সত্য হচ্ছে পুরো সমাজ শাসিত হচ্ছে পুঁজির নিয়মে।তাই,সমাজের প্রকৃত শাসক হচ্ছে পুঁজি। তাইতো এই সমাজের নাম হচ্ছে পুঁজিতন্ত্র। অতঃপর, এখানে পুঁজির মালিক পুঁজিপতিরাও দাস বটে পুঁজির। তাইতো, পুঁজির স্বার্থে এরা অসংখ্য ছোট–বড় যুদ্ধ সহ দুই দুটি বিশ্ব যুদ্ধ করেছে এবং এখনো ওরা যুদ্ধ –যুদ্ধ খেলা খেলছে বা কোথাও কোথাও যুদ্ধ করছে। তাই, পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে একটা যুদ্ধ প্রবণ সমাজ।ফলে, কার্যত যুদ্ধ বা লড়াই বা সংগ্রাম করেই এখানে সকলকে টিকে থাকতে হয়।

উল্লেখ্য, পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্ন করতে হয়। পণ্য বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ হতে পণ্য উৎপাদনের খরচ বাদ দিয়ে যা থাকে তা হচ্ছে পুঁজি। পণ্য উৎপন্ন করতে ভুমি, মেশিনারিজ, কাঁচামাল, জ্বালানি– বিদ্যুৎ বা শক্তি, শ্রম মানে মনুষ্য শ্রম ইত্যাদি আবশ্যক। পণ্য উৎপন্নে মনুষ্য শ্রম যারা দেয় তারা হচ্ছে মজুর। পণ্য উৎপন্নকারী মজুরেরা পণ্য উৎপন্নে মজুরির বিনিময়ে তাদের শ্রম–শক্তি বিক্রি করে। কিন্তু, পণ্যে তারা মানে মজুরেরা যা নিষিক্ত করে তা হচ্ছে শ্রম। অতঃপর, কোনো পণ্যের দাম হচ্ছে সেই পণ্যে নিষিক্ত শ্রম। কারণ, একটি পণ্যে মজুরি শ্রম ছাড়া আর যা যা যুক্ত হয় সেসব ক্রয়ে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হয় ঠিক সে পরিমাণ মূল্যই নতুন পণ্যে যুক্ত হয় বিধায় কোনো পণ্যে মজুরি শ্রম ছাড়া আর কিছু হতে নতুন মূল্য সংযোজিত হয় না। কিন্তু, উৎপাদিত পণ্যের মালিক বটে পণ্য উৎপন্নে যিনি মজুরির বিনিময়ে মজুরের শ্রম–শক্তি ক্রয় করেন তিনি মানে পুঁজিপতি। তাই, পণ্য

বিক্রি করে যে পরিমাণ টাকা পণ্যের মালিক – পুঁজিপতি অর্জন করেন তা হতে পণ্যটি উৎপাদনে ব্যয়িত মজুরি সহ মোট খরচ বাদ দিলে যা থাকে তা হচ্ছে পুঁজি যা পুঁজিতন্ত্রের সুবিধাভোগী শ্রেণীর নানান গোষ্ঠী নিজ নিজ ভূমিকা অনুযায়ী নিজ নিজ হিস্যা নেয় ও তাদের স্বার্থের পাহারাদার রাজনৈতিক শক্তি ও রাষ্ট্রকে দিয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, একটি পণ্য উৎপন্নে মজুরের শ্রম ছাড়া বাকী সব কিছু যদি কোনো পুঁজিপতি সংগ্রহ করে কারখানায় বা তেমন কোনো প্রতিষ্ঠানে রেখে দেন তবে কারখানা বা ঐ প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত সব জিনিষ যে অবস্থায় আছে ঠিক সেই অবস্থায় থাকছে বলে সেসব হতে কোনো নতুন পণ্য উৎপন্ন হচ্ছে না। যেমন, একটি পোষাক শিল্পে যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ, কাপড়, বোতাম, সূতা ইত্যাদি সহ আর যা যা দরকার সব কিছু আছে কিন্তু, মজুরেরা সেসব ব্যবহার করে একটি নতুন শার্ট বা প্যান্ট বানাচ্ছে না তখন সেই পোষাক শিল্পে যত কোটি টাকার মালামাল বা মেশিনারীজ থাকুক না কেন সেখান হতে না কোনো পণ্য তৈরী হবে বা না কোনো ধরণের মূল্য উৎপন্ন হবে। কিন্তু, যখনই, পোষাক কারখানার মজুরেরা তাদের নিজ নিজ কাজ করবে তথা কাটিং বা সেলাই, বোতাম লাগানো তা যে যে কাজ করার দায়িত্বে সে যদি সেই কাজ করে অর্থাৎ মজুরেরা যদি তাদের কাজটি করার জন্য তাদের শ্রম–শক্তির ব্যবহার করে তবে সেই শ্রম–শক্তির ক্রিয়া তথা শ্রম যুক্ত হয় সেই পোষাক কারখানায় উৎপন্ন পণ্যে যার মালিক হয় বটে কারখানাটির মালিক যিনি পণ্যটি উৎপন্নে তার নিজের শ্রম উৎপাদিত পণ্যে নিষিক্ত করেননি। আর মজুরের শ্রম ছাড়া যে তার কারখানায় কোনো পণ্য উৎপন্ন হয়নি তাতো ঠিক। তাহলে, কোনো পুঁজিপতি নয় বরং পণ্য উৎপন্ন করে মজুরেরা তাদের শ্রম–শক্তির ক্রিয়া –শ্রম পণ্যটিতে নিষিক্ত করে।

অথবা, একটি বিল্ডিং তৈরীতে রাজমিস্ত্রিরা যখন ইট, বালু সহ আর যা যা সামগ্রী আবশ্যক সেসবকে নিয়মমতো ব্যবহার করতে তাদের শ্রম–শক্তি ব্যবহার করে তখন ঐ সব সামগ্রীর সাথে তাদের শ্রম যুক্ত হয়ে গড়ে উঠে বিল্ডিংটি। অতঃপর, ইট,বালু, সিমেন্ট, রড ইত্যাদি সামগ্রীর সাথে যখন নির্মাণ শিল্পের মজুরদের শ্রম যুক্ত হয় তখন স্থাপনাটি নির্মিত হয়। কিন্তু, ঐ স্থাপনাটি যখন বিক্রি হয় তখন সেটি নির্মাণে যে সব সামগ্রী ব্যবহৃত হয়েছে সেসবের ব্যয় তথা মজুরদের শ্রম নয় বরং শ্রম–শক্তির দাম –মজুরি সহ সব খাতের খরচ যোগ করে যে পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছে সেই টাকায় নয় বরং আরেকটু বেশী দামে স্থাপনাটি বিক্রি হয় । কারণ, স্থাপনাটিতে মজুরের নিষিক্ত শ্রমের কোনো দামতো সেটির মালিক দেয়নি। তাই, পণ্যে নিষিক্ত শ্রম নয় বরং পণ্য উৎপন্নে মজুরের মজুরির বিনিময়ে যে শ্রম–শক্তি তাদের কর্মস্থলে ব্যয় বা ব্যবহার করে সেই কর্মস্থলে উৎপন্ন পণ্যে তাদের শ্রম নিষিক্ত করে । তাই, কর্মস্থলে হাজির হয়ে পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশী না হয়ে কোনো মজুর তার শ্রম কোনো পণ্যে নিষিক্ত করতে পারে না বিধায় মজুরেরা যেমন তাদের শ্রম বিক্রি করতে পারে না তেমন পুঁজিপতিরাও পণ্য উৎপাদনী প্রক্রিয়া বা পণ্য বিনিময়ের প্রক্রিয়া ছাড়া মজুরের শ্রম নিতে পারে না বলে পুঁজিপতিরা মজুরদেরকে শ্রম–শক্তির দাম দিয়ে মজুরদের শ্রম শোষণ করে বটে কিন্তু , কোনো পুঁজিপতিই মজুরের শ্রম লুট করতে পারে না। আসলে, কর্মস্থলের বাহিরে মজুরেরা তাদের শ্রম কোনো পণ্যে নিষিক্ত করতে পারে না বা পণ্য উৎপন্নে অপরাপর সামগ্রীর মতো শ্রম তেমন কোনো আলাদা পণ্য নয় যা বাজার হতে ক্রয় করা যায়। অথচ, মজুরদের শ্রম নিষিক্ত না হলে পণ্যটি উৎপন্নে আর সকল উপাদান থাকা সত্ত্বেও পণ্য উৎপন্ন হয় না। অতঃপর, একটি পণ্য উৎপন্নে

কাঁচামাল সহ যা কিছু প্রয়োজন সে সবই হচ্ছে পণ্যটি উৎপন্নে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর তবু পণ্য উৎপন্নে মজুরি শ্রম হচ্ছে একটা নিয়ামক ফ্যাক্টর।

বাতাসে অক্সিজেন আছে কিন্তু খালি চোখে তা দেখা যায় না । পণ্যেও মজুরি শ্রম আছে কিন্তু তা দেখা যায় না। পণ্যে মজুরেরা শ্রম নিষিক্ত করে বটে কিন্তু পণ্য উৎপন্নে মজুর বিক্রি করে তার শ্রম–শক্তি। তাই, পণ্য উৎপন্নে মজুরের শ্রম–শক্তি যা মজুরির বিনিময়ে মজুর বিক্রি করে তা হচ্ছে মজুরের পণ্য। কিন্তু, পণ্য উৎপন্নে শ্রম–শক্তি বিক্রি না করে যদি কেহ তার শ্রম–শক্তি ব্যবহার করে কোনো দ্রব্য উৎপন্ন করে তখন কিন্তু সে না মজুর বা তার শ্রম–শক্তিও না পণ্য। পণ্য হচ্ছে তাহা যাহা পুঁজি গঠনে উৎপন্ন করে বিক্রি করা হয় বা বিক্রি করার উদ্দেশ্যে যে দ্রব্য উৎপন্ন করা হয় তা হচ্ছে পণ্য। কিন্তু, সূর্যের আলো সহ প্রাকৃতিক নানান বিষয় কিন্তু দ্রব্য আবার বিক্রি না করে কেবলই ভোগ–ব্যবহারের নিমিত্তে প্রাকৃতিক সম্পদে শ্রম–শক্তি ব্যবহার করে যা উৎপন্ন করা হয় তাহাও হচ্ছে দ্রব্য। অতঃপর, সকল পণ্যই দ্রব্য কিন্তু সকল দ্রব্য পণ্য নয়। আবার সকল শ্রম–শক্তিই পণ্য নয় কিন্তু, পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্নে মজুরের শ্রম–শক্তি যা মজুর বিক্রি করে মজুরির বিনিময়ে তা হচ্ছে মজুরের পণ্য । কাজেই, সকলের সকল শ্রম–শক্তি পণ্য নয় তবে, মজুরের শ্রম–শক্তি যা পণ্য উৎপন্নে বিক্রি করে কেবলই মজুরদের সেই শ্রম–শক্তিই হচ্ছে পণ্য। সুতরাং, মজুরি শ্রম ছাড়া দ্রব্য উৎপন্ন হতে পারে বটে কিন্তু পণ্য উৎপন্ন হতে পারে না । কাজেই, দ্রব্যে শ্রম থাকুক বা না থাকুক কিন্তু মজুরি শ্রম হচ্ছে পণ্যের অপরিহার্য উপাদান।

অতঃপর, পুঁজি বা পুঁজিপতি নয় বরং পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্নে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শ্রম। তাই, পুঁজিতন্ত্রে পুঁজি বা পুঁজিপতি না থাকলে হয়তো পণ্য উৎপাদিত হয় না কিন্তু, মজুরেরা না থাকলে আর পুঁজি, পুঁজিপতি সহ আর সব কিছু থাকলেও পণ্য উৎপন্ন হয় না। আবার , যদি বিক্রির জন্য পণ্য উৎপাদন না করে পুঁজিতন্ত্রে উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় উৎপাদন ও বিনিময়ের যেসব যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি যুক্ত হয়েছে সেসব যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি সমেত প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে দুনিয়ার সকল কর্মক্ষম ব্যক্তি জড়িত হয়ে তাদের শ্রম-শক্তি ব্যবহার করে প্রাকৃতিক সম্পদে তাদের শ্রম নিষিক্ত করে তখন দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য আবশ্যকীয় সকল সামগ্রী উৎপাদন করা কি অসম্ভব? না। অর্থাৎ, পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণী না থাকলেও দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য আবশ্যকীয় সকল জিনিষ কর্মদিবসের খুবই স্বল্পতম সময়ের মধ্যে উৎপাদন করা সম্ভব।

উল্লেখ্য, মজুরেরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের শ্রম-শক্তি বিক্রি করে ঐ সময়কালে তাদের শ্রম-শক্তির ক্রিয়া যা হচ্ছে শ্রম তা সেই সময়কালে উৎপন্ন পণ্যে নিষিক্ত করে। তাতে নতুন পণ্যে যে মূল্য সৃষ্টি হয় সেই পরিমাণ মূল্য হচ্ছে মজুরদের শ্রম। কিন্তু, মজুরেরা সেই সময়কার জন্য শ্রম-শক্তির দাম বাবত পায় মজুরী আর মজুরীর সমপরিমাণ মূল্য মজুরেরা তাদের কর্ম দিবসের মোট কর্ম ঘন্টার একটা ভগ্নাংশেই উৎপন্ন করে। অতঃপর, মজুরদের কর্ম দিবসের অপর ভগ্নাংশ তথা উদ্বৃত্ত -সময়ের জন্য তাদের শ্রম-শক্তির ক্রেতারা কোনো মূল্য পরিশোধ করে না। কিন্তু, মজুরেরা তাদের কর্মস্থলে পণ্য উৎপন্নে তাদের শ্রম-শক্তির ক্রিয়া শুরু করে তথা শ্রম নিষিক্ত করা শুরু করে কর্ম দিবসের পুরো সময় অর্থাৎ মজুরেরা তাদের উদ্বৃত্ত-সময়েও শ্রম প্রদান করে যা পণ্যে মূল্য অতঃপর, উদ্বৃত্ত-মূল্য

সৃষ্টি বা উৎপন্ন করে । অতঃপর, মজুরেরা তাদের উদ্বৃত্ত সময়ে যে উদ্বৃত্ত –মূল্য উৎপন্ন করে তা হচ্ছে পুঁজি অর্থাৎ উদ্বৃত্ত–মূল্য হচ্ছে পুঁজি।

উল্লেখ্য, শ্রম করার জন্য দেহের যে শক্তি ক্ষয় হয় তা হচ্ছে শ্রম–শক্তি। অর্থাৎ, যে কোনো কাজ করতে দেহের যে ক্রিয়া তা হচ্ছে শ্রম–শক্তি। জৈবদেহের ক্রিয়া তা তার প্রকৃতি ও ধরণ যাহাই হোক না কেন তা হচ্ছে মূলত মানব মস্তিষ্ক, স্নায়ু, পেশী প্রভৃতির ব্যয়। অতঃপর, যখন কেহ কোনো জৈবদৈহিক ক্রিয়া শুরু করে তখন তাকে ব্যয় করতে হয় তার মস্তিষ্ক, স্নায়ু, পেশী প্রভৃতি। সুতরাং, মস্তিষ্ক, স্নায়ু , পেশী প্রভৃতি ব্যয়ের যোগ ফল হচ্ছে শ্রম–শক্তি। আর শ্রম–শক্তির ক্রিয়া হচ্ছে শ্রম। কাজেই, মস্তিষ্ক বা পেশী বা স্নায়ুর ব্যবহার ও ব্যয় না করে যেহেতু কোনো শ্রম হয় না সেহেতু কেহই আলাদা আলাদা ভাবে মানসিক শ্রমিক বা দৈহিক শ্রমিক নয় বরং শ্রম করা সকলেই শ্রমিক। কারণ, মস্তিষ্ক যেমন পেশী, স্নায়ু বা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয় আবার স্নায়ু এবং পেশীও মস্তিষ্ক হতে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয় বরং এসবগুলো সমেত আরো কিছু বিষয়ের সমষ্টি হচ্ছে দেহ। অতঃপর,যে কোনো শ্রমেই যেহেতু মস্তিষ্ক , পেশী , স্নায়ু ইত্যাদি যুক্ত সেহেতু কোনো শ্রমেই আলাদা আলাদা করে মস্তিষ্ক যেমন সম্পন্ন করতে পারে না বিধায় মানসিক শ্রম বলে যেমন কিছু হয় না তেমন গতর খাটা বা দৈহিক শ্রম বলেও কিছু হয় না। তাই, শ্রমকে মানসিক ও দৈহিক শ্রম হিসাবে ভাগ–বিভক্ত করা যথার্থ নয় । তবু, শ্রমকে ভুয়া ও বানোয়াটি মূলে মানসিক ও দৈহিক শ্রমে ভাগ–বিভাগ করা কার্যত শ্রমকে বৈজ্ঞানিকভাবে চিহ্নিত না করার শামিল বা ক্ষেত্র বিশেষ শ্রম বিষয়ে অজ্ঞতা অথবা রাজনৈতিক চাতুরালী । অতঃপর, পণ্য উৎপন্নকারী মজুরি শ্রমিকদেরকে

গতরখাটা শ্রমিক আর বেতনভুক মজুর বিশেষত তথাকথিত বুদ্ধিজীবী যারা মস্তিষ্কের ক্রিয়া–বুদ্ধি বিষয়েও হয় অজ্ঞ না হয় ভন্ড ও ধূর্ত তাদেরকে মানসিক শ্রমিক হিসাবে চিহ্নিত ও বিভাজন করে কার্যত পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্নকারী মজুরি শ্রমিকদেরকে ভাগ–বিভাজন ও বিভক্ত করাটা মজুরী শ্রমিকদের শ্রম শোষক পুঁজিপতিদের টিকে থাকার একটা রাজনৈতিক চালাকি,চাতুরালী ও কৌশল।

উল্লেখ্য, শোষণমূলক ও শ্রেণী বিভক্ত দাস সমাজের শোষকদের স্বার্থে সৃষ্ট কথিত গুরুজীরা কেবলই মানসিক শ্রম করা গোষ্ঠী বিধায় সেসব পরজীবী গুরুজীদেরকে সমাজের উপরতলার অভিজাত হিসাবে চিহ্নিত করে দাসদেরকে অনাভিজাত বা নিম্ন বর্ণের গতর খাটা বা গায়ে খাটা হিসাবে চিহ্নিত ও সাব্যস্ত করে যেমন শ্রম বিষয়ে তেমন বুদ্ধি বিষয়ে বানোয়াটি মূলে ভুয়া বিবৃতি দিয়ে গুরুজীদেরকে দাসদের মাথার উপরে রাখার আর দাসদেরকে গুরুজী গোত্রের অভিজাতদের পায়ের নীচে রাখার নিদান –বিধান দিয়ে প্রণাম ও প্রণামীর সংস্কৃতিও চালু করেছে। তাতে, গুরুকুলের পরজীবীরা চিহ্নিত হলেন অতীব সম্মানের ও শ্রদ্ধার ব্যক্তি হিসাবে আর দাসেরা গতরখাটা বলে তারা চিহ্নিত ও শনাক্ত হলেন চরম অসম্মান ও ঘৃণার মানুষরূপী আজব প্রাণী হিসাবে। ফলে, কোথাও কোথাও সমাজের উপরতলার তথাকথিত অভিজাতদের নিকট দাসেরা অস্পৃশ্য হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে তবে, অস্পৃশ্য নারীদেরকে বিবাহ ছাড়াই ভোগ–সম্ভোগ করার সুযোগ বা কোথাও কোথাও নব বিবাহিত নারীর প্রথম রাতের অধিকারতো দাস প্রভুদের দেওয়া হয়েছে কথিত মানসিক শ্রমিক তথা সমাজের উপরতলার অভিজাত গোত্রের সদস্যদেরকে আবার, কোথাও দাসেরা মারা গেলে মৃত দেহ কুকুর দিয়ে খাওয়ানোর বিধানও

জারী ও কার্যকরী করেছে বটে বর্বর দাস সমাজের বর্বর শিরোমনি অসভ্য ও কদাকার শাসকেরা।

ভূমি দাসত্বের সামন্ত সমাজও তথাকথিত মানসিক ও গায়ে খাটা শ্রমিকের বোধ, বিধি-বিধান ও সংস্কৃতি বহাল রাখে সমাজের শোষক-শাসকদের হীন ও সংকীর্ণ স্বার্থে । কিন্তু, আধুনিক শিল্প-কারখানা ভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রে সাবেকী সমাজগুলোর শ্রম বিষয়ক ভূষা ও বানোয়াটি ধারণা বহাল রাখে। আর কলমবাজ বা বক্তৃতাবাজ তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের বানোয়াটি ভুয়া ফতোয়া মতো হচ্ছে মানসিক শ্রমিক আর কারখানা বা পরিবহন বা কৃষি কাজের মজুরেরা হচ্ছে গতর খাটা তথা দৈহিক শ্রমিক। তাই, প্রাতিষ্ঠানিক সনদ না থাকা বা নিম্ন মজুরির মজুরেরা হচ্ছে উল্লেখিত বুদ্ধিজীবীদের নিকটও নীচু জাতের ঘৃণ্য প্রাণী। তাই, গতরখাটা মজুরদের সাথে হাত মিলালেও সোডা -পাউডার দিয়ে কথিত অভিজাতদের হাত ধুতে হয়। কিন্তু,তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা যেমন মজুর বৈ মানসিক শ্রমিক তথা অভিজাত বা আপার ক্লাসের সদস্য নয় তেমন শ্রমঘন কারখানার হয়তো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সনদহীন কোনো মজুরও কেবলই দৈহিক শ্রমিক নয় বরং মজুরেরাও সুস্থ ও স্বাভাবিক মস্তিষ্কের না হলে তাদের নিজ নিজ কাজ করতে পারে না।

অতঃপর, শ্রমে দেহের যে শক্তি ব্যয় হয় তা পূরণে খাবার তথা জ্বালানী অর্থাৎ শক্তি সংগ্রহ করে তবেই ব্যক্তিটিকে আবারো জৈবদৈহিক ক্রিয়া করতে হয়। পুঁজিতন্ত্রে মজুরদেরকে কর্মক্ষমভাবে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য সহ আরো নানান ভোগ্য ও ব্যবহার্য্য পণ্য ক্রয় করেই সেসব পণ্য ভোগ-ব্যবহার করে নিজেদের আবশ্যকীয় শ্রম-শক্তি সংগ্রহ করে মজুরেরা তাদের কর্মস্থলে তাদের শ্রম-শক্তির

ক্রিয়া তথা শ্রম শুরু করে যা পণ্যে নিষিক্ত হয়। অর্থাৎ , পণ্য উৎপন্নে মজুরদের শ্রম–শক্তির ক্রিয়া তথা মজুরদের শ্রম নিষিক্ত হয় বটে পণ্যে । তাই, পণ্যে নিষিক্ত মজুরদের শ্রম পণ্য হতে পৃথক করা যায় না বা তা পৃথক করার মতো কোনো বিষয় নয় । কিন্তু, মজুরদের শ্রমে উৎপন্ন পণ্যের মালিকতো পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্নে মজুরদের শ্রম–শক্তির ক্রেতা– পুঁজিপতি বৈ মজুরেরা নয়। অতঃপর, পণ্যে মজুরদের শ্রম নিষিক্ত হয় বটে কিন্তু পণ্য হতে শ্রম যেমন আলাদা কিছু নয় তেমন মজুরেরা পণ্যের মালিক নয় বলে মজুরেরা তাদের শ্রম বিক্রি করতে পারে না। অতঃপর, পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্নে শ্রম নয় বরং মজুরেরা বিক্রি করে বটে তাদের শ্রম–শক্তি। কিন্তু, পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্নে মজুরদের ব্যয়িত শ্রম–শক্তি পূরণ না করলেতো মজুরেরা বেঁচে থেকে আবারো পণ্য উৎপাদনে মজুরির বিনিময়ে তাদের শ্রম–শক্তি বিক্রি করতে পারবে না।

তাই, পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখতে তথা পণ্যের দুটি উপাদানের একটি– মজুরের শ্রম পণ্যে নিষিক্তকরণের ধারা অব্যাহত রাখতে মজুরের শ্রম–শক্তির যোগান অব্যাহত রাখার শর্তেই মজুরদের শ্রম–শক্তির উৎপন্নের খরচ তথা মজুরি দিয়ে মজুরদের নিকট হতে মজুরদের পণ্য অর্থাৎ মজুরদের শ্রম–শক্তি ক্রয় করতে হয় বটে পুঁজিপতিদেরকে। সুতরাং, মজুরেরা তাদের শ্রম–শক্তির দাম –মজুরি পেলেও তাদের শ্রমের দাম পাওয়ার সুযোগ নাই কার্যত মজুরেরা তাদের শ্রম–শক্তির ক্রিয়া– শ্রমতো নিষিক্ত করে পণ্যে যার মালিক মজুরেরা নয় বিধায় মজুরেরা শ্রম বিক্রির অযোগ্য। তাই, শ্রম–শক্তি বেচা–কেনা হয় বটে কিন্তু শ্রম নয়। অতঃপর, শ্রমের দাম হিসাবে চালু "পারিশ্রমিক" একটি ভূয়া শব্দ একইভাবে মজুরিটাও যখন মজুরদেরকে শোষণ করে মজুরদের শ্রমে উৎপন্ন মূল্য তথা

পণ্যের মালিকানা হতে মজুরদেরকে বঞ্চিত করার একটা কৌশলী শব্দ তখন "ন্যায্য মজুরি" শব্দটাও ন্যায্যভাবে অন্যায্য।

প্রাকৃতিক সম্পদ নিজেই একটা দ্রব্য যার ব্যবহারিক মূল্য আছে কিন্তু বিনিময় মূল্য নাই। প্রাকৃতিক সম্পদে মনুষ্য শ্রম যুক্ত হলে তা দ্রব্য ও পণ্য দুটিই হতে পারে। কিন্তু, ব্যবহার ও বিনিময় মূল্য বিশিষ্ট দ্রব্য তথা পণ্য উৎপন্নে মজুরী শ্রম যুক্ত হয় অর্থাৎ পণ্যে মজুরের শ্রম নিষিক্ত হয়। সুতরাং, কেবল মনুষ্য শ্রম নয় বরং প্রাকৃতিক সম্পদে মজুরের শ্রম নিষিক্ত হলে পণ্য উৎপন্ন হয় । কিন্তু, পণ্যে নিষিক্ত মজুরের শ্রমে পণ্যটি উৎপন্ন হলেও পণ্যটির মালিক হয় বটে পণ্য উৎপন্নে মজুরের শ্রম–শক্তির ক্রেতা পুঁজিপতিরা। তাই, পণ্যে নিষিক্ত মজুরদের শ্রম যেমন মজুরেরা বিক্রি করতে পারে না তেমন পুঁজিপতিরাও মজুরদের শ্রম ক্রয় করে না। সুতরাং, শ্রম কেনা–বেচা যায় না। অতঃপর, মজুরদের শ্রম–শক্তির ক্রেতারা শ্রম–শক্তির দাম হিসাবে মজুরদেরকে মজুরি দিলেও শ্রমের দাম দেয় না এবং দিতেও পারে না । তাইতো, অপরিশোধিত শ্রম হচ্ছে পুঁজি। সুতরাং, মজুরের শ্রম শোষণের ফল হচ্ছে পুঁজি। তাই, পুঁজিপতি মাত্রই মজুরদের শ্রম শোষক আর মজুর মাত্রই পুঁজিপতি কর্তৃক শোষিত । ফলে, পুঁজির জন্ম সূত্রে শোষক পুঁজিপতি ও শোষিত মজুরের সম্পর্কটা হচ্ছে বৈরীতামূলক। তাইতো, পুঁজির জন্মমূলে পুঁজিপতি শ্রেণী আর মজুর শ্রেণীর বিরোধ–বৈরীতা ভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রে শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত মজুর শ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রাম বিদ্যমান বিধায় শ্রেণী সংগ্রামের পুঁজিতন্ত্র শান্তিপূর্ণ হওয়ার সুযোগহীন এক আধুনিক তবে অশান্তির সমাজ বটে পুঁজির জন্ম শর্তে।

উল্লেখ্য, পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপাদন বা বিনিময়ে মজুরির বিনিময়ে শ্রম–শক্তির বিক্রেতা হচ্ছে মজুর। আর পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ে মজুরির বিনিময়ে মজুরের শ্রম–শক্তির ক্রেতা তথা পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ের উপায়াদির মালিক অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তির মালিক এবং নিয়ন্ত্রণকারী তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে জাতীয়করণকৃত সম্পত্তি যা পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের নির্বাহীগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীর সম্পত্তির শেয়ারহোল্ডারগণ বা সমবায় সম্পত্তির নির্বাহীগণ যারা সমবায়িক সম্পত্তি হতে অন্যায্য সুবিধাভোগী বা পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতি মতো যে সকল বেসরকারী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা পরিচালিত হয় সেসব সংস্থার নির্বাহীগণ যারা সংস্থার অধীনস্ত সম্পত্তি হতে অন্যায় ও অন্যায্য সুবিধা গ্রহণ করেন অথবা যারা পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তির রাজনৈতিক সমর্থক ও রক্ষক বা পাহারাদার তারা সকলে হয় পুঁজিতান্ত্রিক সুবিধা পেয়ে বা পাওয়ার লোভে কাজ করেন তারা সকলেই পুঁজিপতি তবে কেহ পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তির মালিক বা নিয়ন্ত্রক হিসাবে আর কেহ রাজনৈতিকভাবে। অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তির মালিক বা নিয়ন্ত্রকরা সরাসরি মজুরদের শোষক বটে তবে তাবৎ সহযোগী সমেত পুঁজিতন্ত্রের রাজনৈতিক ভৃত্যরা সহ পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তি হতে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত–মূল্য তথা পুঁজির অংশ বা ভগ্নাংশ ভোগী সকলেই কিন্তু কম–বেশ মজুরদের শ্রম শোষক তা হোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে।

আবার, পণ্যের উপাদান হচ্ছে ঃ (১) প্রাকৃতিক সম্পদ; এবং (২) শ্রম। প্রাকৃতিক সম্পদের কোনো বিনিময় মূল্য নাই। তাই, পণ্যের বিনিময় মূল্য তথা দাম হচ্ছে পণ্যের অপর উপাদান শ্রম। তাই, শ্রমিকেরা তথা মজুরী দাসেরা হচ্ছে পণ্য উৎপন্নকারী। অতঃপর, পৃথিবীতে যত পণ্য আছে সব পণ্যের স্রষ্টা বা উৎপাদক হচ্ছে মজুর শ্রেণী। কিন্তু, তারা

সেসব পণ্যের মালিক নয় । আর যারা পণ্যের স্রষ্টা বা উৎপাদক নয় সেই তারা অর্থাৎ পুঁজিপতিরা হচ্ছে এসব পণ্যের মালিক। পণ্যের অতঃপর, পুঁজির এরূপ মালিকানা সম্পূর্ণত অন্যায়, অন্যায্য ও অযৌক্তিক। তাছাড়া, মজুরদের সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন পণ্য বা পুঁজির বক্তিমালিকানা হচ্ছে সম্পূর্ণত অযৌক্তিক, অন্যায় ও অন্যায্য। সেজন্য, পণ্য বা পুঁজির অন্যায় ও অন্যায্য মালিক –পুঁজিপতিরা হচ্ছে মজুরদের শোষক আর মজুরেরা হচ্ছে শোষিত। সেজন্য তাদের মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে বৈরীতামূলক।

কাজেই, শোষক পুঁজিপতিরা মজুরদের বন্ধু বা মিত্র নয়। উপরন্ত, পুঁজিপতিরা তাদের পুঁজির স্বার্থে অন্ধ বলে তারা স্বার্থান্ধ একচোখা হেতু জগত ও জীবন এবং সমাজটাকেও খোলা–খোলিভাবে তথা ঠিক–ঠাক ভাবে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকভাবে দেখার অযোগ্য। কিন্তু, মজুর? অন্যায় ও অন্যায্য ব্যক্তিমালিকানাহীন তদপুরি, সামাজিক শ্রমে তবে বৈজ্ঞানিকভাবে পণ্য উৎপন্নকারী বলেই মজুরেরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগিতে জীবন ও জগতকে খোলা–খোলিভাবে দেখার উপযুক্ত শ্রেণী। কিন্তু, শাসকদের সৃষ্ট রাজনৈতিকবোধে আচ্ছন্ন মজুর কিন্তু নিজেকেও ঠিকমতো দেখে না বলে রাজনৈতিক বোধের মাদকতায় আচ্ছন্ন মজুরেরা নিজেদেরকে মজুর নয় বরং পুঁজিপতিদের স্বজন–পরিজন ও নিকটজন বা পুঁজিপতি শ্রেণীর কোনো না কোনো ভগ্নাংশের একজন বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করে।

পুঁজি গঠনে বা উৎপন্নে ও পুঁজিকে রক্ষা করতে পুঁজিপতি শ্রেণীকে পণ্য উৎপাদন করতেই হয়। আবার পণ্য উৎপন্ন করলেই হয় না বরং তা আবার বাজারে বিক্রি করে আয়কৃত টাকা দিয়ে নিজের খরচ সহ পণ্য উৎপন্নের খরচ ইত্যাদি মিটিয়ে এবং পুঁজিতন্ত্রী নিয়মেই

মুদ্রাস্ফীতির হারের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে সঞ্চয়কৃত অর্থে কোনো পুঁজিপতিই পুঁজিপতি হিসাবে তার অবস্থান ধরে রাখতে পারে না বিধায় আবারো পণ্য উৎপন্ন করতে পুঁজিপতি মাত্রই বাধ্য বলে পুঁজিপতিরা পুঁজির দাস বা গোলাম। আবার, পুঁজির দাস বলেই পণ্য বিক্রি করেই ক্ষান্ত থাকলে চলে না বরং প্রাপ্ত অর্থকে পুনরোৎপাদনে বিনিয়োগ করতে হয়। না হয় নতুন পুঁজি যেমন সৃষ্টি হয় না তেমন আগের পুঁজিও থাকে না। তাই, পণ্য উৎপাদন, বিনিময় ও পুনরোৎপাদন করেই পুঁজিপতিকে পুঁজিপতি থাকতে হয় এবং পুঁজির অস্তিত্বও রক্ষা করতে হয়। সুতরাং, পুঁজির অস্তিত্বের শর্ত হচ্ছেঃ (১) পুনরোৎপাদন; এবং (২)বিনিময়। এ দুটোর কোনো একটি সংকটাপন্ন হলে অপরটিও সংকটে পড়ে। ফলে, পুঁজিতন্ত্রে নৈরাজ্য দেখা দেয়, খোদ পুঁজিতন্ত্রী সমাজ সংকটে পড়ে ও বিপন্ন হয়।

এরূপ অবস্থাকে মন্দা বলে । আসলে, পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষার শর্তে পুনরোৎপাদন করতে গিয়ে বাজারের চাহিদার চেয়ে বেশী পণ্য উৎপাদন হয়ে যায় বলে উৎপাদিত অতিরিক্ত পণ্য বিক্রি করা যায় না। তাতে, বাজার ভরা পণ্য থাকে বটে কিন্তু বিক্রি হয় না অনেক পণ্য মানে পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে অতিরিক্ত পণ্য উৎপন্নে বাজারে মন্দা তথা বিক্রি সংকট দেখা দেয়। অর্থাৎ পুনরোৎপাদনের ফলাফল হচ্ছে অতি উৎপাদন আর অতি উৎপাদনের ফলাফল হচ্ছে মন্দা তথা পণ্যের ঘাটতি নয় বরং বাজারে অতিরিক্ত অবিক্রিত পণ্য বিদ্যমান থাকা । ফলে, পুঁজিপতি শ্রেণী সংকটে পড়ে কারখানা বন্ধ করতে হয় এবং মজুরদের সহ অপরাপর পাওনাদারদের পাওনাদি পরিশোধে ব্যর্থ ও অযোগ্য হয়। মজুরেরা বেকার হয় এবং বেকারীর হার বাড়ে। ফলে, লেবার আন রেস্ট,রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিরোধ , যুদ্ধ বা যুদ্ধ অবস্থায় নিপতিত হয় পুঁজিপতি শ্রেণী ।

মন্দায় পুঁজিতন্ত্র যেমন সংকটাপন্ন হয় তেমন পুঁজিপতি শ্রেণীও সংকটে পড়ে আর মজুরেরাও বিপন্ন হয়। মন্দার কবল হতে রেহাই পেতে পুঁজিপতিরা বিভিন্ন কোম্পানীর একত্রীকরণ ও সিন্ডিকেট করা বা রুগ্ন বা বিপন্ন শিল্পকে সরকারীভাবে ভর্তুকি প্রদান বা জাতীয়করণ বা বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সমেত যেসব পদক্ষেপ পুঁজিপতি শ্রেণী গ্রহণ করে তাতে ব্যক্তিমালিকানাকে সংকোচিত করে সামাজিক মালিকানার পথ প্রশস্ত করা হয়। তাতে, ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রে সমস্যা ও সংকট আরো বাড়ে, আবারো মন্দা হয়। কারণ, এসব ধরণের নীতি বা পদক্ষেপ তো ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতিকে রক্ষা করা তথা পুঁজি গঠনের লক্ষ্যে উৎপাদন করার জন্যই গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়। সুতরাং, মন্দা মোকাবেলায় পুঁজিপতিদের গৃহীত কর্মসূচি ও পদক্ষেপ পুঁজিতন্ত্রের সংকট ও সমস্যা আরো বাড়ায় বৈ কমাতে পারেনি।

অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রের নিরাময় অযোগ্য তবে অনিবার্য এক ব্যাধি– মন্দা যা পুঁজিতন্ত্রেরই সৃষ্টি সেই পুনঃপৌণিক মন্দার পরিণতি হচ্ছে সামাজিক মালিকানার তাই, বেচা–কেনা মুক্ত বলে মজুরি দাসত্ব মুক্ত ফলে, শোষণ ও শাসনমুক্ত তাই, স্বাধীন ও মুক্ত মানুষদের তথা সমানদের একটি অত্যাধুনিক সমাজ – কমিউনিজম যার ভিত্তি হচ্ছে সম্পত্তির সামাজিক মালিকানা। তাই ,সামাজিক মালিকানা ভিত্তিক কমিউনিজমে উৎপাদন, পরিবহন ও যোগাযোগের সকল উপায়াদির সমানভাবে অংশীদার বটে মানবজাতির প্রত্যেকেই । ফলে, কমিউনিজমে পরিবার নয় বরং ব্যক্তি হচ্ছে সর্ব নিম্ন ইউনিট।ফলে,কমিউনিজমে কেহ কারো অধীন নয় বরং প্রত্যেকে সমান , স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ।

উল্লেখ্য, জাতীয় সীমানা পর্যাপ্ত ছিল না বিধায় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের কালে পুঁজির অস্তিত্বের শর্তাদির কারণেই তথা পুঁজির সঞ্চালন অর্থাৎ পণ্য বিক্রি, পুনরোৎপাদন ও আবার পণ্য বিক্রি করার জন্যই যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, স্পেন সহ ইউরোপের কতিপয় রাষ্ট্রের পুঁজিপতিরা আমেরিকা সহ পুরো পৃথিবীকে আবিষ্কার ও জয় করে সমগ্র পৃথিবীকে একটি পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতির বিশ্ব বানিয়ে নিজেদের কলোনী করেছে স্ব-স্ব দখলাধীন অঞ্চল ও দেশকে । আবার পণ্য বিক্রির জন্য দুনিয়াময় বাজার সৃষ্টি করায় বাজারের চাহিদা মতো এবং পুঁজিকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিত্য -নতুন পণ্য উৎপন্ন করছে বটে পুঁজিপতি শ্রেণী। পণ্য নিজেই তার চাহিদা সৃষ্টি করে। কিন্তু, নিত্য নতুন পণ্যের কারণে পুরোনো পণ্য বাজার হারায় বটে। কিন্তু, পণ্য বেচা-কেনা করার মাধ্যমেই পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনকে সচল থাকতে হয়। সেজন্য পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে বেচা-কেনা ভিত্তিক একটি বিশ্ব বাজার সহ অসংখ্য পণ্যের একটি বৈশ্বিক সমাজ যেটির বয়স মাত্র ৭০০ বছরের কিছু বেশী কিন্তু,এই সমাজের তথা পুঁজিতন্ত্রের মূল হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-একটি অন্যায়-অন্যায্য ও অযৌক্তিক বিষয় কিন্তু শোষণ, শাসন, পীড়ন, হিংসা-সন্ত্রাস, দমন, অত্যাচার, মিথ্যাচার, প্রতারণা, জালিয়াতি , ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত, দখল-বেদখল , লুট -তরাজ, চুরি-ডাকাতি , ছিনতাই, ঘুষ, হত্যা, ধর্ষণ ও যুদ্ধ - ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিত ও সংগঠিত খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ, ধ্বংসযজ্ঞ ইত্যাদি সহ বিদ্যমান সকল দুস্কর্ম ও অপকর্মের কারণ। আবার, মজুরদেরকে শোষণ করে বা শোষণের হিস্যা আইনী ও বেআইনী পথে বাড়িয়ে নিয়ে নিরন্তর প্রতিযোগীতায় যে যতবেশী সম্পত্তির মালিক হতে পারে সে তত সম্পত্তিবান বটে ব্যক্তিগত সম্পত্তিমূলী পুঁজিতন্ত্রী সমাজে। তাইতো, ব্যক্তিগত সম্পত্তিমূলী পুঁজিতন্ত্রে সকলের সমান

হওয়ার সুযোগ নাই। ফলে, মূলগতভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নির্ভর পুঁজিতন্ত্রী সমাজ পুঁজিপতিদের জন্যও বৈষম্যমুক্ত নয় বা নয় বটে সমতার বরং পুঁজিতন্ত্রে পুঁজিপতিদের মধ্যেও বিভাজন, বৈষম্য ও বিরোধ বিদ্যমান। ফলে, পণ্য বেচা-কেনার বাজারেও পুঁজিপতিরা অসম প্রতিযোগীতার শিকার।

অতঃপর, পুঁজিপতিদের মধ্যকার সম্পর্কও হচ্ছে অসমতার ও অসম প্রতিযোগীতার তাই, পুঁজিপতিদের মধ্যেও ভাগ-বিভাগ ও বিভাজন এবং বিরোধ-বৈরীতা ও বৈষম্যের পুঁজিতন্ত্রে পুঁজিপতিদের মধ্যেও সমতা ও সহযোগীতার অবস্থা নাই বিধায় অসমতা ও অসম প্রতিযোগীতার পুঁজিতন্ত্রে এমনকি পুঁজিপতিদেরও সমবিকাশের সুযোগ নাই । তাই, পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে অসম বিকাশ বা অসম উন্নয়নের একটি অসমতার ও অসম প্রতিযোগীতার সমাজ। আর পুঁজিপতি শ্রেণী এবং মজুর শ্রেণীর মধ্যকার বিভাজন, বিরোধ ও বৈষম্যতো হচ্ছে পুঁজির জন্মশর্তাধীন ও জন্মসূত্রাধীন একটি বিষয়। তাই, ভাগ-বিভাগ, বিভাজন-বিভক্তি ও বিরোধ-বৈষম্যের পুঁজিতন্ত্রে পুঁজিপতিদেরও স্বস্তি ও শান্তি নাই বরং অসম প্রতিযোগীতায় হেরে গেলেই স্বীয় অস্তিত্ব হারিয়ে পড়ে যেতে হয় মজুরের কাতারে। ফলে, অনিশ্চয়তা, ভীতি, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, নিদ্রাহীনতা, অশান্তি ইত্যাদি হচ্ছে স্থায়ী অনিশ্চয়তা ও অশান্তির পুঁজিতন্ত্রে পুঁজিপতিদেরও রোজনামচা। সুতরাং, পুঁজিতন্ত্রের অসম প্রতিযোগীতার বাজারে টিকে থাকতে সদা লড়াইয়ে লিপ্ত বটে প্রতিটি পুঁজিপতি।

অতঃপর, অসম প্রতিযোগিতার বাজারে টিকতে পুঁজিপতিকে কম দামের পণ্য উৎপন্ন করতে হয়। কারণ, দামে কম কিন্তু মানে ভাল ও টিকসই পণ্যই ক্রেতারা ক্রয় করে বটে পুঁজিতন্ত্রী নিয়মে। আবার,

পণ্যে নিষিক্ত শ্রমই যেহেতু পণ্য মূল্য তাই, যত কম শ্রমে কোনো পণ্য উৎপন্ন করা যায় তত সেই পণ্যের মূল্য কম হয়। অতঃপর, কম দামে পণ্য উৎপন্নে পুঁজিপতিকে পণ্যে মজুরি শ্রম কমাতে হয়। কিন্তু, পণ্য উৎপন্নে মজুরি শ্রম কমাতে হলে পণ্য উৎপন্নের যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ ও উন্নতকরণ আবশ্যক। অতঃপর, পণ্য বিক্রির অসমপ্রতিযোগিতায় লিপ্ত পুঁজিপতিদেরকে পণ্যের দাম কমিয়ে তথা কম শ্রমে পণ্য উৎপন্নে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পুঁজিপতি শ্রেণীকে উৎপাদন ও যোগাযোগের যন্ত্রপাতির বিরামহীন বিপ্লবীকরণ করে টিকতে হচেছ বলে পুঁজিতন্ত্রের নিয়মেই পুঁজিপতি শ্রেণী কার্যত পুঁজিতন্ত্রই আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত ও বিকাশ সাধন করেছে। পণ্য উৎপন্নের যন্ত্রপাতি যেহেতু একটি পণ্য তাই, নিত্য নতুন পণ্য যেমন তৈরী করতে হচ্ছে তেমন বিজ্ঞানের নানান আবিস্কার করার দায়–দায়িত্ব নিতে হচ্ছে খোদ পুঁজিপতি শ্রেণীকে। অতঃপর,প্রকৃতি বিজ্ঞান সহ আধুনিক বিজ্ঞানের নানান শাখার সূচনা ও প্রসার যা হয়েছে তা হয়েছে বটে পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে তথা পুঁজি টিকে থাকার জন্য এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর টিকে থাকার জন্য। অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রেই বিজ্ঞানের নানান আবিষ্কার হচ্ছে।

অতঃপর, প্রাচীন সমাজেতো প্রশ্নই উঠে না, দাস সমাজেও নয় এমনকি, প্রকৃতি নির্ভর , স্থানীয় ও খুবই দরিদ্র কৃষি ভিত্তিক প্রায় অনঢ় ও অচল সামন্ত সমাজেও আধুনিক বিজ্ঞান বা এখনকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বা যোগাযোগের উন্নতর প্রযুক্তি সহ ডিভাইস ইত্যাদি আবিষ্কার ও উদ্ভাবনতো হয়ওনি এমনকি, কথিত স্থির পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্যের ঘুরার – জিওসেন্ট্রিজমের ভুয়া – বানোয়াটি তত্ত্ব ব্যতিত সূত্রায়িত হয়নি সোলার সিষ্টেমের তত্ত্বও। ফলে, পৃথিবী ঘুরার গতিতো নয়ই বরং তখনকার ব্যক্তিরা জানতে

পারেনি যে খোদ পৃথিবীটা গতিশীল ও ঘুরে বটে সূর্যকে কেন্দ্র করে আর জানার সুযোগ পায়নি বটে পৃথিবীর ভর, ওজন, আয়তন ও পরিধি। তাছাড়া, এনাটমিতো নয়ই এমনকি তারা জানতে পারেনি মানব সন্তান জন্মে পার্টনারদের উভয়ের সমান অংশীদারিত্ব তথা ২৩ + ২৩ অর্থাৎ ২৩ জোড়া ক্রোমোজমে নবজাতকের জন্ম হওয়ার তথ্যও।

তবু, পুঁজিপতি শ্রেণী তাদের পুঁজি বিষয়ে মজুরদেরকে বিভ্রান্ত করতে যত্তোভাবে সম্ভব বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে নানান প্রপাগান্ডা করেই ক্ষান্ত থাকছে না বরং কেবলই পুঁজিপতি শ্রেণীর সংকীর্ণ স্বার্থে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করার কারণে সমাজের বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে বিজ্ঞানকে ব্যক্তিমালিকানা তথা পুঁজির শিকলে বন্দী করে আধুনিক পুঁজিতন্ত্রী সমাজের অনোপযুক্ত দাস সমাজের বর্বর শাসকদের বর্বর রাজনৈতিক বোধের চর্চা ও প্রসারে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে পুঁজিতন্ত্রী সমাজকে পিছনের দিকে টেনে নিতে গিয়ে নিজেরা চরম প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে চরম হিংস্রতায় উন্মত্ত হয়ে সমাজকেও ক্রমাগত উন্মত্ততা ও উন্মাদনার দিকে নিয়ে যাচ্ছে বলে এখন সামান্য কারণেও যখন তখন খুন-খারাবির সংখ্যা বাড়ছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রীকেও যেমন সামান্য কারণে হত্যা করা হয়েছে, তেমন ভারতে সম্প্রতি স্ত্রী পাশে শুতে দিতে রাজী হয়নি বলে স্বামী পাথর দিয়ে মাথা থেতলে স্ত্রীকে হত্যা করেছে। তাতে, বিজ্ঞানের কাংখিত বিকাশ যেমন বিঘ্ন ও রুদ্ধ হচ্ছে তেমন পুঁজিতন্ত্রী সমাজের বিজ্ঞান বিষয়ক নীতির স্ব-বিরোধী ও দ্বিচারিতা প্রকট হচ্ছে বলে এমনকি, নতুন নতুন প্রযুক্তি সহ বৈজ্ঞানিক ডিভাইস ব্যবহার নিয়েও সামাজিক বিরোধ ও সংকট বাড়ছে । যদিচ, আখেরে বিজ্ঞানের চরম বিরোধীরাও ঠেকায় পড়লে আধুনিক চিকিৎসা সহ তাদেরই

ঘোষণামূলে নিষিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক ডিভাইস ব্যবহার করে বিজ্ঞানের নিকট হার স্বীকার করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে শরমিন্দা হয় না।

উল্লেখ্য, বিজ্ঞান হচ্ছে কোনো কিছু সৃষ্টি বা গঠন বা পরিবর্তন বা রূপান্তরের কোড। তাই, প্রকৃতির কোডও হচ্ছে বিজ্ঞান। ফলে, বিজ্ঞান হচ্ছে প্রকৃত সত্য অর্থাৎ মিথ্যা হওয়ার সুযোগহীন একটি সত্য। আবার, ব্যক্তিগত নয় বরং বিজ্ঞান হচ্ছে সার্বজনীন। অথচ, আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা ও প্রসার সাধনকারী সমাজ তথা পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে মূলগতভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক। তাই, পুঁজিপতি শ্রেণী আধুনিক বিজ্ঞানকে মূলত পুঁজির স্বার্থে ব্যবহার করা বৈ বিজ্ঞানের সার্বজনীনতাকে কবুল করতে পারছে না। যদিচ, ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রই আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা ও বিকাশ ঘটিয়েছে তবু বিজ্ঞান নিজে যেমন সার্বজনীন তেমন তা ব্যবহারিকভাবেও সার্বজনীনতার শর্তাদি তৈরী ও উন্মুক্ত করছে বটে পুঁজিতন্ত্রী নিয়মেই। তৎসত্ত্বেও, স্বার্থান্ধ পুঁজিপতি শ্রেণী স্বীয় সংকীর্ণ স্বার্থে বিজ্ঞানকে পুঁজির শিকলে আটক ও বন্দী করে রাখার অপচেষ্টা করছে। উল্লেখ্য, পুঁজির শিকলে বন্দী না থাকলে বিশ্বমারী করোনার জীবানু আবিষ্কার করা সহ করোনা মোকাবেলায় তথা করোনাকে পরাজিত করতে আবশ্যকীয় ১০০% কার্যকরী ও জীবন মেয়াদী টিকা সহ মেডিসিন আবিষ্কার ও ব্যবহার করতে যে ৩ মাসের বেশী সময় দরকার ছিল না তাতো এতদসংক্রান্ত আমাদের নানান রচনায় আমরা প্রমাণ করেছি। এবং এটা সম্ভব ছিল যদি দুনিয়ার শাসকদের ক্লাব সদস্যরা সহমতে এতদ্বিষয়ে দুনিয়ার সকল বিজ্ঞানীকে একত্রে কাজ করতে এতদসংক্রান্ত দুনিয়ার সকল তথ্য–উপাত্ত ও তত্ত্ব উন্মুক্তভাবে ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে এতদ্বিষয়ক দুনিয়ার সকল ল্যাবরেটরীকে অবাধে

ব্যবহার করতে দিত এবং সম্মিলিতভাবে মজুরদের উৎপন্ন তবে পুঁজিপতি শ্রেণীর নিকট রক্ষিত সামাজিক তহবিল হতে করোনা বিশ্বমারি প্রতিহতকরণে সকল ব্যয় নির্বাহ করে সম্মিলিতভাবে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বমারী করোনা বিরোধী লড়াইটা করত।

কিন্তু, কোনো শাসকই তা করার চিন্তাও করেনি বরং কভিড-১৯ মোকাবেলার কে কত দান খয়রাতে দিচ্ছে তা নিয়ে রাজনীতি করার পারদর্শিতার প্রতিযোগীতায় লিপ্ত থেকেছে কম-বেশ। আর শাসকদের নিজ নিজ আওতাধীন এতদসংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলো করোনা বিশ্বমারির টিকা বা অন্যান্য সামগ্রী উৎপন্ন করে কে কত বেশী পুঁজি হাসিল করতে পারবে সেদিকেই অধিকতর মনোযোগী থেকেছে। বিশ্বমারিতেও পুঁজিপতিরা পুঁজির লোভে মানুষকে বাঁচানোর বৈজ্ঞানিক পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন না করে নিজ নিজ পুঁজির বহর বাড়ানোর ঘৃণ্য অপচেষ্টা করে কেহ কেহ করোনার প্রথম বছরেই ৫০-৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নিজ নিজ তহবিলে যোগ করেছে আর নতুন করেও বিলিনিয়ার হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে কেহ কেহ। ফলাফল স্বরূপ, কভিড-১৯ এর প্রায় ৩ বছর হতে চলল অথচ, এখনো করোনার উৎপত্তির কারণ এবং করোনার রাসায়নিক উপাদান, গঠন, প্রকৃতি, স্থায়ীত্ব ইত্যাদিও আবিষ্কৃত হয়নি।

অথচ, তথ্য-প্রযুক্তিসহ বিজ্ঞান এখন যে অবস্থানে আছে তাতে বিজ্ঞানকে পুঁজিতন্ত্রী সমাজের মূল- ব্যক্তিমালিকানার কবল হতে মুক্ত করে বিজ্ঞানের প্রকৃতিমতো বিজ্ঞানকে সার্বজনীন ও মুক্তভাবে ব্যবহার করা হলে সমগ্র সমাজটা তাবৎ রাজনীতি, মতাদর্শ, দর্শন ইত্যাদি সহ সকল অবৈজ্ঞানিক বোধ বা ধারণা হতে মুক্ত হয়ে সমানদের একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ হিসাবে উন্নীত হত বলে উন্নততর

সমাজের সকল মানুষ বিজ্ঞানী হিসাবে কাজ করে সামান্য জীবানুতো বটেই বরং প্রকৃতি জয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করে প্রকৃতিকে মানুষের সর্বাধিক কল্যাণে ব্যবহার করত।তাতে, সমাজের যে উন্নতি ও সমৃদ্ধি হতে পারত তাতো কল্পনার অতীত। আর প্রচলিত রোগ–ব্যাধি হতে মুক্ত হতে বা থাকতে তেমন কোনো সমস্যা হত না পুরো মানবজাতির।

অতঃপর, গড়ে ১০% বেকার ও ছদ্ম বেকার সহ ৩.৪৩২ বিলিয়ন লেবার ফোর্স সমেত দুনিয়ার প্রায় ৮ বিলিয়ন মানুষের গড় মাথাপ্রতি আয় ১২,৮০০ আমেরিকান ডলার এবং তৎসহ উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদি এবং প্রযুক্তি সহ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও পুঁজিতন্ত্রে এখনো কৃত্রিম দারিদ্রতার কবলে নিদারুন দুঃখ–দুর্দশার জীবন যাপন করছে ৩ বিলিয়নের বেশী মানুষ আর ৮০ কোটির বেশী মানুষ প্রতি রাতে না খেয়ে থাকে , সুপেয় পানি হতে বঞ্চিত বটে ৩ বিলিয়নের বেশী মানুষ আর দারিদ্র জনিত কারণে দৈনিক ২২,০০০ শিশু মৃত্যু বরণ করে। আসলে, বর্ণিত মৃত শিশুরা খুন হচ্ছে বটে শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণ, শাসন ও লোভের কারণে।

কিন্তু, পুঁজিপতি শ্রেণী না থাকলে পুঁজির কারণে শিশু খুন , স্বয়ংঘাতি খুন, ব্যক্তিগত খুন ও যুদ্ধে খুন হওয়া সহ তাবৎ খুন–খারাবী সহ তাবৎ পুঁজিতন্ত্রী দুর্দশা ও দুর্ভোগে ভোগতে হত না কাউকে। এখন যারা পুঁজিপতি তাদেরও কোনো ক্ষতি হওয়ার কারণ নাই আসন্ন বৈজ্ঞানিক সমাজে। কারণ, তারাও সমাজের আর সকলের মতোই উৎপাদন, পরিবহন ও যোগাযোগের সকল উপায়াদির সমানভাবে মালিক হেতু সমাজের কাজে যেমন অংশীদার বলে শারিরীকভাবে সক্ষম আর সকলের মতোই নিজ নিজ সক্ষমতা মতো উৎপাদন সহ সামাজিক

কাজে যোগ্য ও উপযুক্ত বিধায় তারাও সমাজের সর্বাধিক কল্যাণে যেমন কাজ করবেন তেমন সমাজের তহবিল হতে প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র গ্রহণ ও ভোগ-ব্যবহারে উপযুক্ত ও যোগ্য। তবে, তারা কেবল তাদের অন্যায়-অন্যায্য ও অযৌক্তিক পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানা হতে ন্যায়ত ও যুক্তিসংগভাবে বঞ্চিত হয়ে তাদের শোষণ করার বর্বর ক্ষমতাটা খুবই ন্যায়সংগত ভাবে হারাবেন। কিন্তু, অসম প্রতিযোগিতার নিশ্চিত অনিশ্চয়তার জীবন হতে মুক্তি পেয়ে তারাও সুস্থ, স্বাভাবিক ও মানবিক মানুষ হিসাবে আজীবন শান্তিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার সকল সুযোগ -সুবিধা সমেত সমাজের আর সকলের মতোই বৈজ্ঞানিক জীবন-যাপন করবেন। কিন্তু, পুঁজিতন্ত্রে পুঁজির শর্তে পুঁজিপতিরা লোভী- হিংস্র, অনিশ্চিত, উদ্বিঘ্ন ও উন্মত্ত পুঁজিপতির জীবন ছাড়তে নারাজ।

পুঁজিতন্ত্রী সমাজে বাঁচতে হলে যে সব পণ্য ভোগ-ব্যবহার করে বাঁচতে হয় তা অর্থাৎ সেসব পণ্য কিনে তবেই তা ভোগ-ব্যবহার করতে হয়। অর্থাৎ, পুঁজিতন্ত্রী নিয়মেই পুঁজিতন্ত্রে ভোগ-ব্যবহারের সত্ত্ব লাভের শর্তও নির্ধারিত। অতঃপর, যার যতো বেশী পুঁজি বা টাকা আছে সে ততবেশী পণ্য কিনতে পারে নিজের ভোগ-ব্যবহারের জন্য। সেকারণে, পুঁজিতন্ত্রে প্রত্যেকেই টাকা রোজগারের জন্য চরম প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। তাই, পুঁজিপতিরাও যেমন এখানে প্রয়োজনে যুদ্ধ করে বাজারে টিকতে গিয়ে চরম অমানবিক ও নিষ্ঠুর কাজের ভয়ানক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত তেমন মজুরেরাও তাদের শ্রম-শক্তি বিক্রির বাজারে ভয়ানক প্রতিযোগিতার মধ্যে আছে। অতঃপর, যে পুঁজিপতির যতবেশী পরিমাণ পুঁজি আছে সে ততবেশী ক্ষমতাবান প্রতিযোগী বলেই পুঁজিতন্ত্রে যে যতবেশী ক্ষমতাবান প্রতিযোগী সে ততো বেশী টিকে থাকে বলেই পুঁজিহীন মজুরেরা কেবল

পুঁজিপতিদের চেয়ে কম বয়সে মারা যায় না বরং মজুরদেরকে বাঁচতে হয় বটে পুঁজিপতি শ্রেণীর শর্তে ও স্বার্থে তাও নিয়ম বটে জঘন্য বিশ্রী, কুৎসিৎ ও কদাকার পুঁজিতন্ত্রের ।

বেশী পুঁজি ও কম পুঁজির মালিকদের অসম প্রতিযোগীতায় সাধারণত ছোট পুঁজির মালিকেরা হারে। তবে, এরকম অসম প্রতিযোগিতায় কখনো কখনো বেশী পুঁজির মালিকরাও হারে এবং হেরে যাওয়া পুঁজিপতিদের কেহ কেহ মজুরদের কাতারে নামে। আবার মজুরেরাও চাকুরী হারায়। তবে, যে মজুর যত বেশী দক্ষ ও অভিজ্ঞ সে মজুর শ্রম-বাজারে তত ক্ষমতাবান প্রতিযোগী। মজুরদেরকে সে সক্ষমতা অর্জন করতে হয় প্রথমত ভাল ও উচ্চতর পেশাগত ডিগ্রির ভাল সার্টিফিকেট হাসিল করে এবং দ্বিতীয়ত কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করে। সেই জন্যই, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং , কম্পিউটার সায়েন্স সহ আধুনিক পেশার উপযোগী শিক্ষার ভাল সনদ মানে ভাল রেজাল্টের সার্টিফিকেট শ্রম-বাজারে ভাল দামে তথা মজুরীতে বিক্রির জন্য আবশ্যক। ভাল সার্টিফিকেটের বাজারও বৈশ্বিক। তাই, বিশ্বের অনোন্নত অংশের পেশাগত কাজের শিক্ষা সনদধারীরা আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপের নানান দেশ সহ অষ্ট্রেলিয়ায়ও চাকুরি করে থাকার ও বসবাসের অনুমতি পায়, নাগরিকত্বও পায় । আর যারা সে রকম সার্টিফিকেট অর্জন করতে পারে না বা যাদের পারিবারিক বা নিজের সে পরিমাণ পুঁজি বা পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তি মানে কারখানা, ব্যাংক, সুদে খাটানোর মতো টাকা, দোকান, পরিবহন, ভাড়ায় খাটানোর মতো যোগাযোগের হাতিয়ারাদি বা বাড়ী ইত্যাদি নাই তারা কম মজুরির মজুর হিসাবে নানান দেশে যায় বটে কিন্তু তারা সহ সারা দুনিয়ার কম মজুরির মজুরেরা কি কি কাজ করে ও কি ধরণের

দুর্ভোগ ও দুর্দশার জীবন যাপন করে তাতো একটু খোঁজ-খবর করলে বা আশে-পাশে তাকালেই পরিষ্কার দেখা যায়।

তবে, বাজারের নিয়মে অসম প্রতিযোগিতার কারণে নিশ্চিত অনিশ্চয়তার পুঁজিতন্ত্রে কেহই নিরাপদ ও সুরক্ষিত নয়। তাইতো, বিশ্বের ১ নম্বর ধনীও কেবল এক রাতেই লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা লোকসান করে ২০২২ সালের প্রথম ৬ মাসে সেই ১ নম্বর ধনী ব্যক্তি সহ প্রথম ১০ জনের আরেকজন পুঁজিপতি তথা ওরা দুজন মোট ১২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার লস করেছে । আবার টানা কয়েক বছরের ১ নম্বর ধনীও ১৬ নম্বরে নামে আবার, বিলিনিয়ার সমেত কেহ কেহ সংকটগ্রস্ত হয়ে সুসাইডও করে। অতঃপর, অসম এবং চরম প্রতিযোগিতার পুঁজিতন্ত্রে টিকতে শক্ত-পোক্ত প্রতিযোগী হতে হয় কিন্তু, টিকে থাকার গ্যারেন্টি অনিশ্চয়তার পুঁজিতন্ত্রে নাই। তবু, ছাত্ররাও যেমন তীব্র প্রতিযোগিতা করে উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করতে হয় তেমন শিক্ষা শিল্পও সেই প্রতিযোগিতার বাইরে নয় কারণ,এই শিল্পেও ক্ষমতাবান প্রতিযোগী তৈরীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করেই টিকে থাকার চেষ্টা করতে হয়।

এরূপ তীব্র ও অসম প্রতিযোগীতার গণনঅযোগ্য পণ্যের পুঁজিতন্ত্রী সমাজকে ভোগবাদী সমাজও বলা হয়। বাঁচতে হলে ভোগ -ব্যবহার করতে হয় বটে কিন্তু ভোগবাদ সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে বাঁচার পথে প্রতিবন্ধক । উল্লেখ্য, ভোগবাদ মানে জীবনের মোক্ষ হিসাবে কেবলই ভোগ, ভোগ আর ভোগকেই স্থির করে ‘ খাও দাও ফূর্তি কর ’ রূপ পলিসিতে জীবনকে তথাকথিত উপভোগের বা জীবনের সাফল্যের বা সফলতার মান দন্ড বিবেচনা করা। উল্লেখ্য, চিরকালীন অভাব-অনটনের দাস-সামন্ত যুগের বৈষ্ণববাদ যেমন স্বাভাবিক

জীবনের জন্য গ্রহণযোগ্য নয় তেমন কৃত্রিম দারিদ্র সমেত প্রাচুর্য্য ও সমৃদ্ধির আধুনিক পুঁজিতন্ত্রে জীবনকে কেবলই এক ভোগ সর্বস্ব জীবে পরিণত করার পলিসি চর্চাও পরিত্যাজ্য বৈ স্বাভাবিক নয়। এমনকি, ভোগবাদ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের জন্যও স্বাভাবিক নয় বলেই আমেরিকা সহ দুনিয়াময় বহুজনের বহুরোগের কারণ সৃষ্টিকারী ব্যাধি- ওবেসিটিতে আক্রান্ত বটে পুঁজিপতি শ্রেণীর এক ভগ্নাংশ। আবার ভোগবাদে আক্রান্ত মজুরেরাও তাদের জীবনের সকল দুর্ভোগ-দুর্দশা ও বন্দীত্বের কারণ - পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তির মোহে নিজ শ্রেণীর স্বার্থের বিপরীত ও বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে সামগ্রীকভাবে মজুর শ্রেণীর ক্ষতির কারণ হয়। তবু, পণ্য উৎপন্ন ও বিক্রি হলেই পুঁজি গঠিত ও রক্ষিত হবে মর্মে পুঁজিপতি শ্রেণী ভোগবাদের লালন-পালন ও পরিপোষণে নানান কলা কৌশল করা সহ স্বাস্থ্য সহ নানান বিষয়ে ক্ষতিকর ভোগবাদের প্রচার ও প্রসারে বিপুল অর্থ ব্যয় করে।

উল্লেখ্য, বেঁচে থাকার জন্য দেহের জ্বালানী তথা শক্তি দরকার। খাদ্য হতে আমরা শক্তি সংগ্রহ করে থাকি। কিন্তু, এখন প্রচলিত কৃষিজাত খাদ্য গ্রহণ না করেও আমরা রাসায়নিকভাবে খাদ্য সমস্যার সমাধান তথা দেহের শক্তির যোগান নিশ্চিত করার মতো বৈজ্ঞানিক অবস্থায় উপনীত হয়েছি এবং ভবিষ্যতে আরো সহজভাবেও দেহে আবশ্যকীয় শক্তি যোগানোর বিহীত করা সম্ভব। সন্দেহ নাই, হালের বিজ্ঞান অন্তঃত এটা নিশ্চিত করছে যে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান তবে চিরশান্তির, চিরানন্দের ও চিরতারুণ্যের চির সবুজ স্বাস্থ্য সমেত একটি মানবিক জীবন যাপনে পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তি রক্ষা ও সংরক্ষায় মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ-শাসন করতে বিদ্যমান সকল আইন-কানুন বা শিকল হতে মুক্ত - স্বাধীন জীবনের সমানদের একটি বৈজ্ঞানিক সমাজই কাফি।

পুঁজিতন্ত্রে উৎপাদিত নতুন নতুন পণ্য নিজেই নিজের চাহিদা সৃষ্টি করে ভোক্তার সংখ্যা যেমন বাড়ায় তেমন পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্ব রক্ষার শর্তে পুঁজিপতিরা নিত্য নতুন পণ্য তৈরী করে একদিকে যেমন পূর্বে তৈরী পণ্যকে অচল পণ্যে পরিণত করে তেমন নতুন পণ্যের ভোক্তা তৈরী ও ভোক্তার সংখ্যা বাড়িয়ে পণ্যকে বিক্রি করতে হয়। অতঃপর, টাকা হলেই এখানে এই পুঁজিতন্ত্রী সমাজে অসংখ্য পণ্য কেনা যায় এবং ভোগ ও ব্যবহার করা যায়। তাইতো, ভোগের মাত্রা পুঁজিতন্ত্রে বাড়বেই এবং ভোগ না করারও কারণ নাই তবে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যক। পুঁজিপতি শ্রেণী স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্ন ও বিনিময়ের কারবার করে বটে কিন্তু এই পুঁজিতন্ত্রী কারবারের নীতিতো সামাজিক কল্যাণ –অকল্যাণ নিয়ে ভাবার সুযোগহীন বরং কেবলই পণ্য উৎপাদন ও বিনিময় করে পুঁজি গঠন ও পুঁজির পরিমাণ বাড়িয়ে চলার স্বার্থান্ধ নীতি অনুসরণ করে বলেই পারমানবিক ও জীবানু অস্ত্র সহ নানান গণ বিধ্বংসী অস্ত্র যেমন উৎপন্ন করে পুঁজিপতি শ্রেণী তেমনি স্বাস্থ্যের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর বলে উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ মাদকও উৎপাদন ও বিপণন করে বটে শোষক পুঁজিপতি শ্রেণী। এমনকি, মাদক উৎপাদন বা বিনিময় করা সহ সেসব নিষিদ্ধ কাজ করতে গিয়ে বিনা বিচারে মারা যায় বটে জড়িতদের কেহ কেহ। আসলে পুঁজি লোভী স্বার্থান্ধরা মুনাফার হার কয়েকগুণ দেখলে নিজেদের মৃত্যু ঝুঁকি নিয়েও সেই সব নিষিদ্ধ বা চরম ঝুঁকিপূর্ণ খাতে পুঁজি বিনিয়োগ করে।

বাঁচার জন্য ভোগ–ব্যবহার করতে হয় কিন্তু ভোগবাদীরা ভোগ–ব্যবহারের জন্য বাঁচে। তাইতো, নিছক ভোগবাদীরা কেবলই ভোগ ও সম্ভোগ করাটাকেই জীবনের লক্ষ্য ও মোক্ষ হিসাবে সাব্যস্ত করে সমগ্র শরীরকে বিবেচনা করা নয় বরং দেহের ষ্টোমাক ও কথিত

সেক্সসুয়াল পার্টসের মধ্যে পুরো শরীরটাকে ডুবিয়ে রাখতে গিয়ে নিজেরাই নিছক পশুর মতো হয়ে যায়। মানুষও পশু কিন্তু, মৌলিক কিছু তফাতও আছে উভয়ের মধ্যে । তাই, মনুষ্য জীবন স্বার্থক করার মানে মানুষের তুলনায় কম বুদ্ধির পশু যারা এখনো খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে জানে না সেই পশুদের মতোই কেবল খাবার খেয়ে ও প্রজনন করে বংশ বিস্তার করে একদিন মরে যাওয়ার জীব হতে পারে না। কিন্তু, শোষক পুঁজিপতিরা এক্ষেত্রে বন্য হিংস্র পশুরও অধম।

আবার অসংখ্য প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে মানুষই একমাত্র প্রজাতি যে প্রজাতির একাংশ আরেকাংশকে শোষণ করে পরজীবি জীবন যাপনে নিজেদেরকে শোষক ও শোষিত শ্রেণীতে ভাগ-বিভাজন করে শোষিত শ্রেণীকে শোষণ করতে নানানভাবে ও নানান শিকলে বন্দী করে শাসন করার নিমিত্তে শোষক শ্রেণী নিজেকে শাসক শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত ও গণ্য করে শোষিত শ্রেণীকে শাসিত শ্রেণী হিসাবে গণ্য করতে গিয়ে কার্যত যেসব আইন-বিধি ও বোধের জন্ম , সৃজন ও বহাল করেছে তাতে কার্যত শাসক শ্রেণীও বন্দীত্বের কবলে নিপতিত হয়েছে হেতু শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক ভৃত্যরা তথা শাসকেরাও নানান প্রথা, রীতি -নীতির শিকলে ও শিকড়ে বন্দী ও আটকা পড়েছে।

তবু, শোষক-শাসক শ্রেণীটিই হচ্ছে সমাজের অন্যায়, অন্যায্য ও অযৌক্তিক সুযোগ-সুবিধাভোগী আর শোষিত- শাসিত শ্রেণী খুবই অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে তাদের ন্যায্য ও যৌক্তিক সুযোগ- সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। নিঃসন্দেহে, মানুষ ছাড়া অপরাপর প্রজাতির প্রাণীগুলো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রকৃতি ও বৈরী প্রজাতির প্রাণীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আর মানুষেরা প্রকৃতি ও বৈরী প্রাণীদের

বিরুদ্ধেতো লড়েই উপরন্ত লড়াই করে বটে মানুষদের একাংশের বিরুদ্ধে আরেকাংশ বস্তুত, মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং লড়তে হবে ততদিন যতদিন না মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ–শাসন শেষ হয়। কি ভয়ানক লজ্জার কথা!

এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে মানুষের বয়স দুই লাখ বছর। তন্মধ্যে বন্য জীবন তথা প্রকৃতি নির্ভর এক অঞ্চলের কতিপয় মানুষ অপরাপর এলাকার মানুষ বিষয়ে বা সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকে অপরাপর বন্য প্রাণীদের মতো কাটিয়েছে প্রায় ১ লাখ ৯৫ হাজার বছর। সেই সময়কার সমাজকে আদি বা প্রাচীন সমাজ বলা হয়। উল্লেখ্য, ১৩৭০ কোটি বছর পূর্বে বিগ ব্যাংগের মাধমে সৃষ্ট মহাবিশ্ব তার যাত্রা শুরু করে। কিন্তু, এখনো মহাবিশ্ব তথা ইউনিভার্সের পরিসর ও পরিধি যেমন বাড়ছে তেমন নতুন নতুন নক্ষত্র, গ্রহ , উপগ্রহ ইত্যাদি জন্ম নিচ্ছে। একই প্রক্রিয়ায় ৪. ৬০৩ বিলিয়ন বছর মানে ৪ শত ৬০ কোটি ৩০ লক্ষ বছর পূর্বে আমাদের সৌর জগতের কেন্দ্র তথা সূর্য নামক নক্ষত্রটি সৃষ্টি হয়েছে এবং উক্ত সূর্যের জগতের একটি গ্রহ–পৃথিবী ৪.৫৪৩ বিলিয়ন বছর মানে ৪ শত ৫৪ কোটি ৩০ লক্ষ বছর পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে।

সুতরাং, প্রাকৃতিকভাবে বৈ কোনো মানুষ বা ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি নয় পৃথিবীটা আর পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর মতো মনুষ্য প্রজাতিও প্রাকৃতিক নিয়মেই সৃষ্টি হয়েছে্ বলে মানুষেরাও প্রকৃতিজাত প্রাণী। বিজ্ঞানীদের প্রাপ্ত তথ্য মতে ৩.৫ বিলিয়ন বছর মানে সাড়ে ৩ শত কোটি বছর পূর্বে নন–লিভিং ইলিমেন্ট হতে লিভিং ইলিমেন্ট – সেল অর্থাৎ কোষ উৎপন্ন হয়েছে। আর এককোষী প্রাণী হতেই সকল প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিটি কোষই জীবন্ত এবং নিজেই

নিজের প্রতিলিপি তৈরী করতে পারে। মানব দেহ হচ্ছে বহু কোষ সম্বলিত একটি সত্ত্বা। তবে, কেবল মাত্র মানব মস্তিষ্কে ৮০ বিলিয়ন সেল আছে। তাই, প্রতিটি মানব দেহে ততটাই প্রাণ আছে ঠিক যতটা সেল আছে কারো দেহে । তবে, মানুষ ছাড়া পৃথিবীর অপরাপর কোনো প্রজাতির প্রাণী পৃথিবীটাকে তাদের কারো পিতা বা নানার সৃষ্টি হিসাবে দাবী করেনি। কিন্তু, দাস সমাজের শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক ভৃত্য- শাসকেরা তাদের রাজনৈতিক বদ মতলবে বানোয়াটি মুলে পৃথিবীটাকে তাদের কারো কারো দাদা -নানা বা তেমন কারো তৈরীকৃত বলে বানোয়াটি মূলে মিথ্যা দাবী করে সেই ভুয়া বিবরণের ভিত্তিতে রচিত দাবী যা কেবল অসত্য নয় বরং অন্যায় ও অন্যায্য তবু সেই অন্যায্য দাবী মূলে নিজেদেরকে ভূয়াভাবে কথিত স্রষ্টাদের উত্তরাধিকার হিসাবে দাবী করে দাস সমাজের শাসকেরা খুবই অন্যায়, অন্যায্য ও অযৌক্তিকভাবে নিজ নিজ দখলীয় জমি-জমার মালিক দাবী করার পূর্ব পর্যন্ত তথা আদিম সমাজে কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না।

উল্লেখ্য, পৃথিবীটা যেহেতু প্রকৃতিজাত বৈ কারো দাদা বা নানার সৃষ্ট নয় তাই, প্রকৃতিজাত মানুষদের কেহ কথিত ভূয়া স্রষ্টার উত্তরাধিকার হিসাবে ভূয়া দাবী করে পৃথিবীটাকে তাদের নিজ নিজ দখল সত্ত্বমূলে ভাগ-বিভক্ত করে নিজেরা ভোগ-দখলীয় সম্পত্তি হিসাবে ব্যবহারের নিমিত্তে যে মালিকানা তথা ব্যক্তিমালিকানার প্রবর্তন করেছে তা প্রাকৃতিক নিয়ম নয় বরং প্রাকৃতিক নিয়ম বিরোধী। তাই, প্রাকৃতিকভাবেও অন্যায় , অন্যায্য ও অযৌক্তিকভাবে সৃষ্ট ব্যক্তিমালিকানা কেবল অন্যায় ও অযৌক্তিকই নয় বরং প্রকৃতি বিরোধী এক কৃত্রিম তবে জঘন্য মালিকানা । সেজন্য অন্যায়, অন্যায্য ও কৃত্রিম ব্যক্তিমালিকানা হচ্ছে দখল-বেদখল, শোষণ-লুণ্ঠন, খুন-

ধর্ষণ ইত্যাদি সহ সমাজে বিদ্যমান সকল দুস্কর্ম ও অপকর্মের কারণ, উৎস ও ভান্ডার।

অতঃপর, আদিম সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক শ্রেণী ছিল না তাই, আদিম সমাজে শ্রেণী শোষণ ও শ্রেণী শাসন ছিল না, আর শাসনের জন্য রাষ্ট্র ছিল না, পরিবার ছিল না এবং ছিল না কোনো শাসক ও শাসনের জন্য আইন-বিধি ও নিদান তাই, ছিল না আইন ভংগে কোনো অপরাধ ও দন্ড তাই, প্রাচীন সমাজে ছিল না বিচার বিভাগ বা বিচারক ও পুলিশ। অতঃপর, সেই প্রাচীন সমাজে ছিল না বটে আইন সম্মত হত্যার নিমিত্তে সৃষ্ট কোনো স্বশস্ত্র বাহিনী।

প্রকৃতপক্ষে, এখনো বন্য প্রাণীগুলো যে ভাবে বসবাস করে আদি সমাজের মানুষেরাও সেইভাবেই বাস করত। এখনো আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ , আফ্রিকার জংগল ও আমাজানের জংগলে বসবাসকারী আদিম মানুষেরাও কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন তাই, শ্রেণীহীন ফলে, শাসক মুক্ত বলে রাজনীতি-দর্শন বা মতাদর্শ মুক্ত তাই তারা সহজ-সরল মানুষ। অতঃপর, প্রাচীন সমাজে প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা মানুষেরা খাদ্যের জন্য কখনো কখনো হিংস্র হলেও মানুষে মানুষে কোনো ভাগ-বিভাগ, বিভাজন ও বৈষম্য ছিল না ।

তাই, আদিম সমাজে নারী-পুরুষে বা সেক্সের ভিত্তিতে কোনো ভাগ-বিভাজন ও বৈষম্য ছিল না। প্রাকৃতিক নিয়মেই তারা সেক্স করত , সন্তান জন্ম দিত এখনো বন্য প্রাণীরা বা খুবই কম সংখ্যক হলেও আন্দামান বা আফ্রিকা বা আমাজানের আদিম মানুষেরা যেভাবে সন্তান জন্ম দেয়।

তাই, প্রাচীন সমাজে মানুষে মানুষে প্রেম-ভালোবাসা এবং সেক্স ছিল অবাধ ও মুক্ত এবং প্রাকৃতিক নিয়মে। উভকাম বা সমকাম বা

বহুগামিতা এরকম শব্দ তখন ছিলনা কিন্তু এ শব্দগুলো দ্বারা হালের সমাজপতিরা যে সব ক্রিয়া বুঝাতে চান তা কিন্তু ছিল যেমন পশুদের বহু প্রজাতির মধ্যে এগুলো দৃশ্যমান তবে পশুদের ক্ষেত্রে সেসব নিষিদ্ধ নয় বা দন্ডনীয় অপরাধযোগ্য ক্রিয়া নয়। কারণ, পশুদের কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই। ফলে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করে ব্যক্তিগত সম্পত্তিবানদের সংকীর্ণ পরজীবিতার স্বার্থ দেখভাল করার জন্য বন্য পশুকুলে কোনো শাসক নাই, নাই কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। অতঃপর, বন্য পশুদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে নেই বন্য পশুদের সৃষ্ট কোনো আইন-বিধান। তাই , আইন-বিধান বা নিদান বাস্তবায়নে পশুকুলে নাই কোনো বিচারক ও পুলিশ। তবে, বন্য পশুরা মানুষ প্রজাতিভুক্ত শোষকদের সৃষ্ট রাজনৈতিক সীমানায় বন্দী হলেও শোষিত মজুরদের মতো শোষণ-শাসনের শিকলে বন্দী নয়।অন্যদিকে, পণ্য উৎপন্নকারী মজুরেরাও বন্য পশুর মতোও মুক্ত নয়।

দুনিয়ার নানান স্থানে জীবনধারণকারী একই প্রজাতির প্রাণী যেমন ভিন্ন স্থানে থাকা স্বপ্রজাতির বিষয়ে জানে না তেমন প্রধানত বন-জংগলে জীবনধারণকারী মানুষেরাও অপরাপর অঞ্চলের মানুষদের জানত না বা চিনত না বরং প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল এবং প্রাকৃতিক নিয়মে মরা ও বেঁচে থাকা মানুষগুলো ছিল বটে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে জীবনধারণকারী এক একটা গোষ্ঠী বিশেষ। বৈরী প্রজাতির প্রাণীদের কবল হতে নিরাপদে থাকতে ও প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বেঁচে থাকার মতো অনুকুল তাপানুসন্ধানে সেই সকল গোষ্ঠী বদ্ধ মানুষেরা তুলনামূলক নিরাপদ জীবনের প্রত্যাশায় নিরাপদ ভৌগোলিক অঞ্চলের সন্ধানে বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন করেছে বটে

গমনাগমনের পথ–ঘাট না জেনেই কেবলই বেঁচে থাকার তাগিদে অন্ধের মতোই তাতো এখন নৃতাত্ত্বিকেরা নিশ্চিত করেছে।

কালক্রমে একগোষ্ঠি মানুষ যখন আরেক গোষ্ঠী মানুষকে দেখেছে কিন্তু কেহ–কাহাকে চিনা–জানার সুযোগ ছিল না তখনই উভয়গোষ্ঠীর মানুষেরা পরস্পরকে পরস্পরের জন্য বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বলেই বিবেচনা করে প্রতিপক্ষের নিকট হতে নিরাপদ থাকতে একে–অপরের বিরুদ্ধে লড়াইতে নেমে হয়তো উভয় পক্ষ নিহত হয়েছে বা জীবত কেহ কেহ অন্যত্র পালিয়েছে বা একপক্ষ আরেকপক্ষকে পরাজিত করে পরাজিত পক্ষকে দাস বানিয়ে বিজয়ী পক্ষ দাসদের মালিক বনে দাসদেরকে তখনকার সময়কার কাজ তথা প্রধানত শিকার ও আহরণের মাধ্যমে অর্জিত খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী যোগাড় করিয়ে সেসবের মালিক বনে গিয়ে দাস মালিকেরা দাসদের শ্রমে পরজীবী ও আয়েশী জীবন নিশ্চিত করতে তাদের সৃষ্ট ভাগ–বিভাজন ও বৈষম্য জারী রাখতে এবং সেসবকে ন্যায্যতা ও গ্রাহ্যতা দিয়ে দাসদেরকে চিন্তার জগতেও একতরফা, অন্ধ আনুগত্যশীল তথা দাসোচিত চিন্তার একটি শ্রেণী হিসাবে বশে রাখার জন্য বা প্রয়োজনে দমন–পীড়ন ও শাসনের জন্য রাজনীতির সূচনা করে, আইন–কানুন তৈরী ও তা বাস্তবায়নে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ তথা রাজা–বাদশা সেজে বসে। দাস মালিকদের পরজীবিতার সংকীর্ণ স্বার্থের পাহারাদার রাজা–বাদশা এবং দাস মালিক ও দাসদের নিয়ে স্থানীয় বা আঞ্চলিক পরিসরের সমাজ হচ্ছে দাস সমাজ– ইতিহাসে প্রথম শোষণমূলক–শ্রেণী বিভক্ত তবে একটি রাজনৈতিক সমাজ।

দাস প্রভুরা তথা দাসদের মালিকেরা তাদের সৃজিত রাজনীতিকে নিয়েও করেছে মিথ্যাচার । তাদের শাসন ক্ষমতার উৎস হিসাবে

ভয়ানক ক্ষমতাধর নানান দৈব শক্তিকে হাজির করে সেই সব মহাক্ষমতার দৈব শক্তির ইচ্ছেয় ও দয়ানুকুল্যে শাসকেরা দৈব ক্ষমতাধর হিসাবে নিজেদেরকে উপস্থাপনে বানোয়াটিমূলে নানান মাইথোলজি সৃজন ও প্রচলন করে যাতে দাসেরা দৈব ক্ষমতাধারী রাজা–বাদশাদের প্রদত্ত মৃত্যুদন্ড সহ সব ধরণের সাজাকেও মেনে নেয়। তখন হতে তাদের তথা শোষক –পরজীবীদের সংকীর্ণ স্বার্থে সৃষ্ট আইন এবং আইনের লংঘন বা ভংগ করাকে অপরাধ গণ্যে অপরাধের সাজা হিসাবে নানান দন্ড ইত্যাদির বিধান চালু করে তাদের হীন স্বার্থ বহাল রাখতে বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করে বটে দাস সমাজের শাসকেরা তথা শোষক–পরজীবী দাস মালিকদের রাজনৈতিক ভৃত্য তথা রাজনীতিকেরা যারা মূলত রাজস্বভোগী পরজীবী।

তাই শোষণ–শাসনের নিমিত্তে ও হেতুবাদে সৃজিত ও প্রবর্তিত রাজনীতি যেমন জন্মসূত্রে শোষক শ্রেণীর সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষাকারী তেমন বহাল আছে শোষক–শাসকদের হীন স্বার্থেই। শোষণ–শাসন হচ্ছে বর্বরতার সর্বোচ্চ রূপ । তাই, শোষণ –শাসনকে ন্যায্যতা, গ্রাহ্যতা ও বহাল রাখার নীতি– রাজনীতি জন্ম সূত্রে ও জন্ম শর্তে সকল বর্বর নীতির সুপ্রিম নীতি নয় কি? শোষণ–শাসনে যা যা করা হয় তা তা যেমন মন্দ বা দুস্কর্ম তেমন শোষক–শাসকদের সৃজিত রাজনৈতিক বোধে ও নিদানে শোষণ–শাসনে সৃজিত ও বহাল আইন–কানুন ভংগ করাও হচ্ছে শাসকদের বিধানে দন্ডনীয় দুস্কর্ম। ফলে, সমাজে বিদ্যমান সকল অপকর্ম–দুস্কর্ম সংঘটনের নীতিও হচ্ছে বটে রাজনীতি। সুতরাং, রাজনীতি হচ্ছে সকল মন্দ বা খারাপ কর্মের নীতিগুলোর সুপ্রিম নীতি ।

অতঃপর, শোষণ-শাসনের নিমিত্তে নানান বর্ণ, শ্রেণী ও সেক্সের পরিচয়ে মানুষের কৃত্রিম পরিচয় নির্ধারণের নীতি; জগত ও জীবন বিষয়ে কৃত্রিম বোধের কল্প-কাহিনী রটনার নীতি ; এবং সমাজে বিদ্যমান সকল বর্বরতা, দুস্কর্ম ও ক্ষতিকর কর্ম সংঘটনের নীতি মানেইতো রাজনীতি নয় কি? কোনো সন্দেহ নাই, শাসকদের সৃজিত রাজনৈতিক বোধ হচ্ছে খারাপ, ক্ষতিকর এবং বিষাক্ত তাই পরিত্যাজ্য। সুতরাং, মুক্তির শর্ত হচ্ছে রাজনীতির সমাপ্তি। অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তির বিলুপ্তিতে শ্রেণী সমূহের বিলোপনের মাধ্যমে রাজনীতির কৃত্রিম পরিচয়ের মানুষেরা তাদের রাজনৈতিক বোধ ও রাজনৈতিক পরিচয় হতে মুক্ত হয়ে মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিকবোধ ও পূর্ণ মানবিকবোধ সম্পন্ন মানুষ অর্থাৎ প্রকৃতার্থে মানুষ হবে স্ব-বিরোধীতার পুঁজিতন্ত্রে সূচিত ও উদ্ভাবিত পুঁজিতন্ত্র বিরোধী নীতি সমূহের সফল রূপায়নে ।

উল্লেখ্য, রাজনৈতিক সমাজ হচ্ছে কৃত্রিম সমাজ আর রাজনৈতিক বোধও হচ্ছে কৃত্রিম বোধ । তাই, রাজনৈতিক পরিচয় হচ্ছে কৃত্রিম পরিচয়। তাই, রাজনৈতিক বোধ মুক্ত, রাজনৈতিক পরিচয় মুক্ত এবং রাজনৈতিক সমাজ মুক্ত একটি এক ও অখন্ড -অবিভক্ত তবে মানবিক বোধে পরিপূর্ণ একটি মানবজাতির একটি অত্যাধুনিক সমাজ- কমিউনিজম হচ্ছে সমানদের একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ, একটি মানবিক সমাজ যা হচ্ছে ইতিহাসের শেষ রাজনৈতিক সমাজ- পুঁজিতন্ত্রের এক ঐতিহাসিক এবং অনিবার্য পরিণতি। অবশ্যই, দাস সমাজ ছিল ইতিহাসের এক অনিবার্যতা কিন্তু ন্যায় সংগত নয়। কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিণতিতে অবশ্যই একা শোষিত মজুর শ্রেণী কর্তৃক বিজিত-অর্জিত রাজনীতি মুক্ত বৈজ্ঞানিক সমাজ- কমিউনিজম হচ্ছে কেবল ইতিহাসের অনিবার্যতা ও অপরিহারযোগ্য সমাজই নয়

বরং সম্পূর্ণত ন্যায্য, ন্যায় সংগত , যৌক্তিক ও সুসংগত একটি অত্যাধুনিক সমাজ।

দাস সমাজে খোদ দাসেরা সম্পত্তি হিসাবে গণ্য ছিল। আবার যে রাজা তার রাজ্য যতটুকু বিস্তার করতে পারত ততটুকু ছিল তার নিজস্ব সম্পত্তি । অতঃপর, দাস সমাজে যারা দাস ও ভূ-সম্পত্তি সহ নানান ধরণের সম্পত্তির মালিক ছিল তাদের সম্পত্তি কিভাবে সংরক্ষিত হবে তা বিবেচনা করে স্রেপ সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার সংকীর্ণ স্বার্থে যথার্থ তথা বৈধ উত্তরাধিকারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষায় সেক্সের ভিত্তিতে মানুষকে প্রধানত নারী ও পুরুষে ভাগ করে কথিত নারী সেক্সধারীকে নারী হিসাবে শনাক্তকৃত নারীর গর্ভ হতে সন্তান ডেলিভারী হয় বলে নারীকে সন্তান ধারণ, জন্মদান ও লালন-পালনের জন্য গৃহীনির জীবনে আবদ্ধ স্ত্রীতে পরিণত করে স্ত্রীকে স্বামীর সম্পত্তি গণ্যে স্বামির মালিকানাধীন সম্পত্তি সংরক্ষণে বৈধ উত্তরাধিকার জন্মানোর একটি মেশিন এবং পুরুষের সম্ভোগের সামগ্রী হিসাবে সাব্যস্তে নারীকে কারো রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্তরাধিকারতো নয়ই বরং কোনো কোনো শাসক উত্তরাধিকার হিসাবে ভূ-সম্পত্তি সহ সম্পত্তিতে পুরুষের তুলনায় নারীর হিস্যা সাংঘাতিক রকমের কম নির্ধারণ করে আর কোনো কোনো শাসক নারীকে সম্পত্তিরও উত্তরাধিকার হিসাবে চিহ্নিত ও গণ্য না করে নারীকে নিজের সম্পত্তির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকার সুযোগহীন করে কার্যত নারীকে পুরুষের আশ্রয়ে বেঁচে থাকার শর্ত সৃষ্টি করেছে বটে বর্বর দাস সমাজের বর্বর শিরোমনি- সকল বর্বর শাসক আর সেই কদাকার শাসকদের সৃষ্ট সেই অন্যায় ও অযৌক্তিক শর্তে মানুষের একাংশকে আরেক অংশের সম্ভোগের সামগ্রী তথা মানুষে মানুষে ভোক্তা-ভুক্তির বিশ্রী -কুৎসিৎ ও কদাকার সম্পর্ক ঘোষণা ও

কার্যকর করতে নারীর জন্ম বিষয়ে নানান কল্পকথা বানোয়াটি মূলে বানিয়ে তাদের যে অংগকে নারী অংগ হিসাবে চিহ্নিত করেছে সে অংগকে তার স্বামীর জন্য অক্ষত রাখার নাম কুমারিত্ব আর কোনো অবস্থায় স্বামি ছাড়া আর কাউকে সেই অংগ ব্যবহার করতে না দেওয়ার বিধান ও বোধ হল সতীত্বের বোধ আর সেই বোধে জীবন যাপনকারী হচ্ছে সতী।

প্রকৃতপক্ষে, কুমারিত্ব ও সতীত্ব রূপ ধারণা ও বিধি–বিধান ও নীতি–নিদান জারি ও বহাল করার আবশ্যকতা ছিল কারো স্ত্রীর গর্ভে যাতে স্বামী ব্যতিত আরো কারো সন্তান জন্ম নিতে না পারে। অর্থাৎ স্বামীর সম্পত্তি যাতে স্বামীর বীর্যজাত সন্তান সহ স্বামীর যথার্থ উত্তরাধিকারীরা লাভ করতে পারে। তাতে, সন্তানে মায়ের সমান হিস্যা যা দাস সমাজের শাসকদের জানা ছিল না তাহাই কেবল অস্বীকৃত হল এমনটাই নয় বরং দাস সমাজের শাসকদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে নারীকে তার পিতৃ বর্ণ বা বংশের পরিচয় পরিত্যাগ করে স্বামীর বংশের বা বর্ণের পরিচয়ে স্বীয় পরিচিতি লাভ করতে হচ্ছে বটে স্ত্রী হিসাবে স্বীকৃতি পেতে । তাইতো, শিশুর জন্ম উপাদানে মায়েরও সমান হিস্যার সন্তানরা তাদের মায়ের পিতৃ বর্ণ বা বংশের নয় বরং নিজেদের বর্ণ বা বংশ পরিচয় লাভ করে বটে তাদের পিতৃ বংশ বা বর্ণের এবং এখনো এই আধুনিক পুঁজিতন্ত্রেও। লজ্জা!

অতঃপর, কুমারিত্ব ও সতীত্বকে এতোটাই তবে কৃত্রিমভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও মহিমান্বিত রূপে হাজির করা হল যে কুমারিত্ব ও সতীত্ব রক্ষায় আবশ্যক হলে নারী তার জীবন বিসর্জন দিবে। ভারতীয় মাইথোলজীর বিবরণে ভগবান হিসাবে স্বীকৃত ও অযোধ্যা রাজ্যের রাজা রামের স্ত্রী –সীতাকেও সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। দাস

সমাজের আগে যা ছিল না কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য যে কুমারিত্ব ও সতীত্ব রূপ রাজনৈতিক ধারণার জন্ম দিল শাসকেরা সেটিকে একজন নারী তার জীবনের চেয়ে বেশী মূল্যের স্থির করে নারীর সকল মান-সম্ভ্রম , ইজ্জত-সন্মান ইত্যকার সব কিছুকে একজন নারীর কথিত নারী অংগের মধ্যে সীমিত করে সেটিকে অতিগোপনীয় অংগ হিসাবে নিদান জারী করা হল। কিন্তু, শরীরের অংগাদি জানে না কে? যা সকলে জানে তাও কি গোপন বিষয় বলে চিহ্নিত হতে পারে? অথচ, দাস সমাজের শাসকদের সৃজিত লজ্জা-শরমের সেই কৃত্রিম বা ভুয়া বোধকেই কার্যত অস্বীকার করে কথিত লাজ-শরমের সেই সব কথিত গোপনাংগকে পাবলিকলীও প্রকাশ্যে নিয়ে আসে যখনই কাউকে নারী বা পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত করতে যে সব নাম সাব্যস্ত করেছে সেসব নামে ডাকে বা কাউকে ছেলে বা মেয়ে বা হিজড়া হিসাবে পরিচয় করায় বা চাচা-মামা, বা চাচি-মামি বা মাসি-পিসি বা দাদা-দিদি বা বৌদি ইত্যকার শব্দে কেউ কাউকে সম্বোধন করে।

অতঃপর, শাসকদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে নারী দেহ বৈধভাবে সম্ভোগ ও বৈধ সন্তান উৎপন্নের জন্য নারীকে মহলে বা গৃহে আটক বা বন্দী রাখতে বিবাহ নামীয় সামাজিক প্রথা চালু করেছিল দাস সমাজের শাসকেরাই। তাতে, গঠিত হল পরিবার। সম্পত্তির মালিক বলে পরিবারে কর্তা রাজার মতোই পরিবারের এক স্বেচ্ছাচারী, কর্তৃত্ব পরায়ন ও হিংসাশ্রয়ী ভয়ংকর শাসক। পরিবার হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক ও শ্রেণী বিভক্ত সমাজের সর্ব নিম্ন ইউনিট। রাষ্ট্রের আইনে-নিয়মে যেমন রাষ্ট্রের বাসিন্দারা শৃংখলিত তেমন পরিবারের সদস্যরাও পরিবারের কর্তার অধীনে পরাধীন কার্যত দাসতান্ত্রিক বোধে।

অতঃপর, বর্বর দাস সমাজের বর্বর শিরোমনি শাসকদের নিদানে-বিধানে মানুষে মানুষে অবাধ ও মুক্ত ভালোবাসা ও প্রেম তথা সহমতে স্বেচ্ছাধীন ও স্বাধীন সেক্স হয়ে গেল বটে এক নিষিদ্ধ বিষয় তবে বৈধ সেক্সকেও করা হল এক গোপনীয় বিষয়। নিষেধাজ্ঞা অমান্যে বা ভংগে আগুনে পুড়িয়ে মারা সহ নানান দন্ডের বিধান জারী হল। ফলে, নারী নামীয় মানুষেরা যেমন মানুষের পরিচয় হারিয়ে এক ভীতু-দুর্বল ও পুরুষাশ্রিত জীবে পরিণত হল আর পুরুষ? বেপরোয়া ক্ষমতাধর তথা চরম বর্বর এক কামুক প্রাণী। কামুক পুরুষের কামের বস্তু হয়েও কামের কামিনী নারী হয়ে গেল এক কামহীন তবে কেবলই যন্ত্র, রক্ত মাংসের যন্ত্র, রমন- সম্ভোগের যন্ত্র, এবং সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বটে সেই বর্বর দাস সমাজের বর্বর শাসকদের জঘন্য ও বর্বর নিদানে ও বিধানে। আবার কোনো কোনো শাসকেরা কামের বস্তু নারীকে স্বকামে বা নিজ উদ্যোগে স্বামী ছাড়া আরো কারো সাথে কামে লিপ্ত হওয়ার বাসনাকে চিরতরে দমন করতে তথা নারীকে কামহীন কামের সামগ্রী হিসাবে কার্যত কেবলই স্বামীর কামের সামগ্রী হিসাবে স্বামীর কামের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে নারী শিশুদের খতনা করার এক হিংস্র, নৃশংস ও জঘন্য বর্বর প্রথার পত্তন করা হয়েছে এবং এখনো কিছু কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই চরম অমানবিক নারকীয় প্রথার প্রচলন আছে।

সন্দেহ নাই, পরস্পরের স্বেচ্ছা সম্মতি ব্যতিত সেক্স করাটা কার্যত ধর্ষণ । কিন্তু, ব্যক্তিগত সম্পত্তি জাত কারণে শ্রেণী ও পরিবার প্রথা চালু হওয়ার পর হতে নারী তথা স্ত্রী তার মালিক - স্বামী কর্তৃকও কম-বেশ ধর্ষিত হচ্ছে। অথচ, প্রকৃতার্থেই স্বামী তার স্ত্রীর ধর্ষক হলেও শোষক-শাসকদের আইনে তা স্বীকৃত নয়। কারণ শাসকেরা স্বামীর ইচ্ছেমতো তার স্ত্রীকে ভোগ-সম্ভোগের অধিকার ও সুযোগ

দিয়ে স্বামীকে তার স্ত্রীর উপর স্বামীত্ব ফলানোর বিধান দিয়েছে। প্রয়োজনে স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীকে মনো-দৈহিক সাজা দেওয়ার এখতিয়ার এবং অধিকারও স্বামীদেরকে দেওয়া হয়েছে। সেজন্যই, স্বামী মানে একজন বা একাধীক স্ত্রীর গর্বিত মালিক মাত্রই কম-বেশ এক স্বেচ্ছাচারী শাসক। তাই, স্বামী হচ্ছে ক্ষেত্র বিশেষ এক হিংস্র প্রাণী । অন্যদিকে, ধর্ষিত বা কলংকিত নারীকে ব্যভিচারি হিসাবে আখ্যায়িত করে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের ফসল সন্তানকে " জারজ" হিসাবে চিহ্নিত করে জারজ সন্তানকে বৈধ সন্তান তথা বৈধ উত্তরাধিকার হিসাবে অযোগ্য ঘোষণা করেছে বিধায় সেই সব নিদানে ধর্ষিত বা ব্যভিচারের শিকার সহ অসতী নারীরা বিবাহের বাজারে বা পরিবারে ও সমাজে কেবল দামহীন বা কমদামী সামগ্রীই নয় বরং ঘৃণারও পাত্র বটে এবং কোনো কোনো নিদানে ব্যভিচারী নারী হত্যা যোগ্য অপরাধী। তাই, বেচা-কেনায় অযোগ্য গণ্যে ধর্ষিত নারীরা আত্মহননের পথেও যায় বা কথিত কুমারিত্ব বা সতীত্ব রক্ষায়ও কেহ কেহ জীবন হারায় ।

আবার. মহলে বন্দী থাকার বিধান দিয়ে নারীকে মহিলা গণ্য করা হয়েছে বলে নারীকে গৃহী জীবনে বাধ্য করতে পুরুষ ছাড়া নারীর বাঁচার প্রায় সুযোগহীন অবস্থা নিশ্চিত করার জন্য এমনকি স্বামী মারা গেলে স্বামীর সাথে সহমরণের প্রথায় কত নারীর জীবন অকালে ঝরে গেছে তার কি হিসাব আছে? সেই হতে স্ত্রী হচ্ছে একটা পেশার নাম বা পদবী যার নিয়োগকর্তা হচ্ছে শিশ্নধারী স্বামী, বিনিময়ে স্বামী দিবে স্ত্রীর তথা তার যৌন দাসীর ভরণ-পোষণ। সেজন্য, বিবাহে উপযুক্ততার বয়সও বেঁধে দিচ্ছে শাসকেরা সাথে বিবাহ যোগ্যতার শর্তাদিও । উপযুক্ত ও যোগ্য পুরুষই কেবল তার বিবাহ যোগ্য ও উপযুক্ত নারীকে বিবাহ করে সম্পত্তি রক্ষার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী

জন্মাতে পারে এবং সেক্ষেত্রে স্বামী যাতে তার স্ত্রীর মালিক ও রক্ষক হিসাবে স্ত্রীকে রক্ষা করা সহ ভরণ-পোষণ দেওয়ার দায়িত্ব পালনে উপযুক্ততা ও যোগ্যতা অর্জন করে তার প্রতিও শাসকেরা নজর দিয়েছে কেবলই ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করে সম্পত্তিবানদের সংকীর্ণ স্বার্থের সেবা করতে।

উল্লেখ্য, দেহের কোনো অংগই কারো ক্ষমতা বা অক্ষমতা বা সবল-দুর্বল হওয়ার কারণ নয় যেমনটা দাস যুগের শাসকেরা উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে বলে কৃত্রিমভাবে নারীকে দুর্বল হিসাবে প্রতিপন্ন করে নিজেকে রক্ষায় নারীকে অক্ষম ঘোষণা করে কেবল পুরুষের অধীনে ও আশ্রয়ে থাকার নিদান দিয়েছে । অথচ, নারীরা তাদের সেই অংগের কারণে দুর্বল নয় আর পুরুষেরাও তাদের শিশ্নের কারণে সবল বা ক্ষমতাধর নয়। অথচ, সেভাবে অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে এখনো দাসযুগীয় রাজনৈতিক বোধে যোনির জন্য নারীকে দুর্বল ও শিশ্নের কারণে পুরুষকে সবল বা ক্ষমতাবান হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। অথচ, ক্ষমতার মূল উৎস হচ্ছে সম্পত্তি। তাইতো, মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে পিতা নয় বরং সম্পত্তির মালিক -মাতাই ক্ষমতাধর। আর, নারী পুঁজিপতির অধীনস্ত পুরুষ মজুরেরা?

নারী দুর্বল সেতো বর্বর দাস সমাজের সর্বাধিক বর্বর তবে শরীর ও শরীরে গ্ল্যান্ড গুলোর ক্রিয়া তথা এন্ড্রোক্রাইনোলজি বিষয়ে জানার সুযোগহীন তাই এনাটমি বিষয়েও একদম অজ্ঞ শাসকদের হীন উদ্দেশ্যজাত সৃজিত ও প্রবর্তিত রাজনীতির বোধে তবে অবশ্যই অবৈজ্ঞানিকবোধে পুরুষেরাও ফালতু ও ভুয়াভাবে ক্ষমতাবান হিসাবে চিহ্নিত বলে কার্যত পুরুষেরাও কথিত পুরুষালী বোধে অসভ্য, বর্বর এবং নিপীড়ক গোত্রের। নারীবাদীরা নারী-পুরুষের বোধ মুক্ত নয়

বলে মানবজাতির একাংশের নারী হওয়া আর আরেক অংশের পুরুষ নামীয় রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণ –সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানাকে স্বীকার না করে কার্যত দাসযুগের বর্বর শাসকদের রাজনৈতিকবোধে আচ্ছন্ন ও পুষ্ট বলেই কথিত পুরুষদের পুরুষালী ক্ষমতা তথা অসভ্যতা ও বর্বরতার জন্য তাবৎ দায়–দোষী করে থাকে বটে শিশ্নকে তবে ,বানোয়াটি মূলে তাই ভুয়াভাবে।

অতঃপর, শিশ্নের কৃত্রিম ক্ষমতায় নারীবাদীরা মোহাচ্ছন্ন বলে তারা শিশ্নধারী তথা পুরুষদের মতো ক্ষমতা চায় কিন্তু পূর্ণ মানবিকবোধ সম্পন্ন মানুষ হতে চায় না । কারণ, তারা পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তির বিলোপনে সম্মত নয়। তবে, নারীবাদের জন্মও দিয়েছে কিন্তু পণ্য উৎপাদনী পুঁজিতন্ত্র।

প্রাণী মাত্রই সেক্স হরমোন সম্পন্ন যা বয়োঃসন্ধিকাল হতে শরীরের কতিপয় গ্ল্যান্ড উৎপন্ন করে। ফলে , একটি শিশু সেই সেক্স হরমোনের কারণে দ্রুত বড় হয়ে এক পরিণত যুবা হয়ে উঠে। তাই, যুবা বয়সের প্রাণী মাত্রই হরমোনাল তাড়নায় সেক্স করাটাই স্বাভাবিক এবং সুস্থ শরীরের জন্য তা আবশ্যক। সেক্স করার মাধ্যমেই বংশ বিস্তার করছে বটে মানুষেরাও । তাহলে নিজের জন্ম যে জানে সেতো তার জন্মের ইভেন্টটাও জানে। তাহলে, সেক্স ইভেন্টটাতো কোনো গোপন বিষয় নয় এবং দেহের কোনো অংগই গোপন নয় কারো নিকটই। কিন্তু, ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষায় দেহের কতিপয় অংগকে পুরো দেহ হতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে ভুয়াভাবে চিহ্নিত করে অংগ বিশেষের অবৈজ্ঞানিক নামকরণ করে সেসবের ভিত্তিতে এখনো নারী, পুরুষ ও হিজড়া হিসাবে চিহ্নিত করে মেয়ে মানুষকেতো নয়ই প্রকৃতার্থে মানুষকে মানুষ হিসাবে স্বীকার না করে মানবজাতির সত্ত্বাকে অস্বীকার

করার মাধ্যমে মানুষের সেক্স ভিত্তিক কৃত্রিম পরিচয়ে কার্যত মানুষ প্রজাতির যথার্থ পরিচয় ও মর্যাদা হানি, ক্ষুন্ন, অবজ্ঞা ও অস্বীকার করা হয়েছে।

দাস ও সামন্ত যুগের শাসকেরা নিজেরাও মানুষের উপরে অবস্থানকারী কথিত মহামানবরূপী একটি অভিজাত গোষ্ঠীর সদস্য ও সেরূপ পরজীবী একটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে সেই গোষ্ঠীর জন্য একস্ট্রা মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে নানান পদ-পদবি ও বানোয়াটি গুণাবলীর ভুয়া ধারণার জন্ম দিয়ে মনুষ্য প্রজাতির উৎপত্তি,জন্ম বৃত্তান্ত ও ইতিহাস বিষয়ে নানান কল্পকথা চালু করেছে। যদিচ, প্রকৃত সত্য হচ্ছে কথিত মহামানবদের সংকীর্ণ স্বার্থে মহামানব হিসাবে গণ্য ব্যক্তিদের বহাল রাখতে মানব জাতির অপরাংশকে সাধারণ বা অর্ডিনারী হিসাবে গণ্য করার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল আর শাসকেরা তাই করেছিল । অতঃপর, কথিত মহামানবদের ও তাদের কুলভুক্ত উত্তরাধিকারদের পরজীবিতার বিলাসী জীবনের সকল দায়- ব্যয় মিটাতে গিয়ে ঘোষিত অর্ডিনারীরা কেবল মর্যাদাহীন, সম্মানহীন ও কার্যত অমানবিক মানুষ হিসাবেই গণ্য হয়নি বরং কথিত অর্ডিনারী মানুষেরা তাবৎ দুঃখ, দুর্দশা ও দুর্ভোগের শিকার হয়েছে।

উল্লেখ্য, দেহের টিকে থাকার জন্য যেমন এখনো খাদ্য, পানীয় আবশ্যক তেমন দেহ হতে বর্জ্য নিষ্কাশণে পায়খানা-প্রস্রাব করাও আবশ্যক। তাই, খাওয়া-দাওয়ার মতোই পায়খানা-প্রস্রাব করাও মানব দেহ টিকিয়ে রাখার জন্য একটি স্বাভাবিক কাজ। একইভাবে, দেহের হরমোনাল গ্ল্যান্ডগুলো হরমোন উৎপন্ন করবে এটাই স্বাভাবিক আর হরমোনাল তাড়নায় মানুষ সেক্সুয়াল এক্টিভিটি করবে এটাও দেহের একটি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক কাজ। তবে, সেক্স না করাটা

প্রস্রাব-পায়খানা না করার মতো খুবই বিপজ্জনক বিষয় নয়। তবে, সেক্স না করার দীর্ঘ মেয়াদী ফলাফল দেহের জন্য ক্ষতিকরতো বটেই। কিন্তু, দাস যুগের শাসকেরা হরমোনাল ক্রিয়াটিকে একটি প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ক্রিয়া হিসাবে না জেনে কেবলই রাজনৈতিক দৃষ্টিতে নারীকে সম্ভোগের সামগ্রী হিসাবে চিহ্নিত করেছে বিধায় স্ত্রী সম্ভোগকে তথা নারী দেহ সম্ভোগ করাকে একটি চরম ও পরম বিনোদন হিসাবে গণ্য করেছে । সেই বর্বর বোধে নারীরা এখনো সম্ভোগের সামগ্রী হিসাবে যথেচ্ছভাবে পুরুষদের বিনোদন প্রবণতার বর্বরোচিত হামলা-আক্রমণের শিকার হচ্ছে এমনকি যান-বাহন সহ যত্র-তত্র এবং যখন-তখন ।

অতঃপর, হরমোনের তাড়না যতোই বোধ করুক না কেন আইনসম্মত উপায় ছাড়া যৌন সম্পর্ককে চরম দন্ডযোগ্য অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করার কারণে মানুষের স্বাভাবিক সেক্সসুয়াল কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ ও অপবিত্র কাজ হিসাবে চিহ্নিত করার হেতুবাদে সেক্স বিষয়ে একদিকে যেমন নানান ট্যাবু তৈরী করা হয়েছে তেমন অতীতের শ্রেণী বিভক্ত সমাজের আদলেই আধুনিক পুঁজিতন্ত্রী সমাজেও নারীর প্রতি পুরুষের যৌন আকর্ষণকে প্রেম-ভালোবাসার মোড়ক পরানো হয়ছে। আসলে, বেচা-কেনার পুঁজিতন্ত্রে নারী নামীয় যৌন পণ্যের জন্য একজন পুরুষের আকাংখা বৈ বিদ্যমান প্রেম-ভালোবাসা আর কিছুই নয়। আর নারীর দিক থেকে? পণ্যের বিক্রেতা মাত্রই বেশী মুনাফা তথা পণ্যের বেশী দাম পেতে আগ্রহী আর ক্রেতাও কম দামে। সেই জন্যই, প্রেম নিয়েও ব্যবসা-বাণিজ্য হয়। তাইতো, প্রেমের নামে প্রতারণা-জালিয়াতি, বিশ্বাসঘাতকতা বা ব্ল্যাক মেলিং ইত্যাদি জঘন্য দুস্কর্মাদি সংঘটিত হয় বটে ব্যবসায়িক বোধে ও নিয়মে।

বস্তুতপক্ষে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পরিবার , রাষ্ট্র ইত্যাদি সমেত শোষণ-শাসন ভিত্তিক বেচা-কেনার অসম প্রতিযোগীতার পুঁজিতন্ত্র প্রেম-ভালোবাসা বা বন্ধুত্বপূর্ণ একটি প্রেমময় জীবনের জন্য প্রেম-ভালোবাসার জন্য প্রেম -ভালোবাসার উপযুক্ত একটি সমাজ নয় অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্র ভালোবাসা -প্রেম ও বন্ধুত্বের একটি সমাজ নয়। তবে, ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন, পরিবার ও রাষ্ট্রহীন এবং পণ্য, পুঁজি ও মজুরি দাসত্ব মুক্ত এবং বেচা-কেনা মুক্ত তাই, বেচা-কেনার প্রতিযোগীতাহীন অতঃপর , অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও অশান্তি মুক্ত অর্থাৎ শোষণ ও শাসনহীন ফলে, মুক্ত ও স্বাধীন মানুষদের তথা সমানদের একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ তথা অত্যাধুনিক তবে মানবিক সমাজ -কমিউনিজমে প্রেম ? নিশ্চিতভাবে নিশ্চিত, শোষণ-শাসন মুক্ত ও মানবিক বোধ সম্পন্ন অখন্ড মানব জাতির কেহ কারো ক্ষতি করার বোধ মুক্ত সমাজ- কমিউনিজমে মিলন সহ প্রেম-ভালোবাসা সমেত প্রত্যেক মানুষ যা ইচ্ছে তা করবে স্বাধীন ও মুক্তভাবে।

উল্লেখ্য, এখনো পর্যন্ত প্রেমের পূর্ণতা প্রকাশিত হয় বিবাহের মাধ্যমে। কিন্তু বিবাহ হচ্ছে প্রেমের সমাধি। কারণ, বিবাহের মাধ্যমে প্রেমিকা পরিণত হয় স্ত্রীতে আর প্রেমিক হয় স্বামী। স্বামী মানে মালিক। অর্থাৎ স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর মালিকানাধীন সম্পত্তি। অতঃপর, স্বামী-স্ত্রীর প্রথাগত বিধি-বিধান ও বোধে বিবাহের মাধ্যমে সাবেক প্রেমিকা হয়ে যায় সাবেক প্রেমিকের স্ত্রী নামীয় সম্পত্তি তথা যৌন সামগ্রী অর্থাৎ যৌন দাসী। অতঃপর, পারিবারিক নিয়ম-বিধি ও মূল্যবোধে একদা প্রেমিকা তার নিজের যতটুকু সীমিত স্বকীয়তা ছিল বিবাহের মাধ্যমে তা হারিয়ে পরিণত হয় তার একদা প্রেমিকের মালিকানাধীন তাই, স্বামীর ভরণ-পোষণ, হেফাজত ও শাসনাধীন এক দাসীতে। এখনো পর্যন্ত সেই দাস যুগীয় রাজনৈতিক বোধে অথচ হাল আমলেও স্ত্রী যদি

প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিও হয় তবু স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দিবেন, তত্ত্বাবধান ও হেফাজত করবেন বটে তার স্বামী। নীচুতা ও হীনতারও একটা মাত্রা থাকা লাগে। কিন্তু, নারীর ক্ষেত্রে ? আর পুরুষের কথা না বলাই ভাল।

দাস আর দাস মালিকের সম্পর্ক হচ্ছে শোষক-শোষিত অতঃপর, শাসক-শাসিতের তাই , ইহা হচ্ছে বৈরীতা ও বৈষম্যের সম্পর্ক। সেজন্যই, শোষিত-শাসিত দাসী -স্ত্রী আর স্ত্রী নামীয় দাসীর মালিক-শোষক ও শাসক স্বামীর মধ্যকার বৈরীতা ও বৈষম্যের নীতিতে গঠিত পরিবার তথা স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ -বিবাদ, রাগ-ক্ষোভ, মারা-মারি, খুনা-খুনি, মামলা-মোকদ্দমা, অশান্তি,অনিশ্চয়তা,উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা,ভীতি ইত্যকার বিশ্রী,কুৎসিৎ,জঘন্য ও নিষ্ঠুর কার্যাদি পরিবারের জন্ম শর্তে ও জন্ম সূত্রে প্রাপ্ত এবং জন্মকাল হতে আজো পরিবারে এসব কম-বেশ বিদ্যমান। তদপুরি, পুঁজিতন্ত্রে নারীরা যেমন প্রাতিষ্ঠানিক পড়া-শুনার সুযোগ পাচ্ছে তেমন কোনো কোনো নারী আয়-উপার্জন করে নিজেরই কেবল নয় বরং স্বীয় সন্তানাদি নিয়েও বেঁচে থাকতে পারছে। উপরন্ত, মেডিক্যাল সাইন্স সহ বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বদৌলতে দেহ বিষয়েও জানতে পারছে নানান বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বও সর্বোপরি, পুঁজিতন্ত্রের একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি -গণতন্ত্রে নারীরাও কেবল ভোটারই নয় বরং যোগ্য বটে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হতেও। আবার, পুঁজিপতিরা বাধ্য হয়ে নারী অধিকার ও শিশু অধিকার বিষয়ক সনদ, নির্দেশিকা ও আইন ইত্যাদিও রচনা ও কার্যকরে অংগীকার করছে নারীদেকে পুঁজিতন্ত্রী সমাজে নানান কাজে লাগাতে। তাই, কোনো এক বর্বর স্বামীর অধীনে না থাকার বা যৌন দাসত্ব সহ দাসী বৃত্তি না করার বা কেবল সেক্সের জন্য বিয়ে করে স্বামীর অধীনে জীবন না যাপনের বোধও নারীদের

মধ্যে তৈরী ও প্রবল করছে বটে পুঁজিতন্ত্র। ফলে, পুঁজিতন্ত্রে, স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক বিরোধ বা দাম্পত্য কলহের হার যেমন ক্রমাগত বাড়ছে তেমন পরিবার বা সংসার ভাংগার হারও ক্রমাগত বাড়ছে।

দাস সমাজের মতোই সামন্ত সমাজ ছিল প্রকৃতি নির্ভর, কৃষি নির্ভর, স্ব-নির্ভর এবং স্থানীয় তবে খুবই দরিদ্র অর্থনীতির একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ। তাই, সামন্ত সমাজেও ভূমি মালিক আর ভূমি দাস প্রধানত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজে ভূমি মালিকেরা ছিল দাস মালিকদের মতোই শোষক, শাসক, পরজীবী ও বর্বর। কিন্তু, দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য আদান-প্রদানের তবে প্রকৃতি নির্ভর ও দ্রারিদ্রতার স্থানীয় সমাজ - দাস সমাজেই কৃষি সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদিত হতে থাকে তবে কুঠির শিল্পে পারিবারিক শ্রমে খুবই ক্ষুদ্রাকারে ও স্বল্প পরিসরে এবং বেচা-কেনাও তাই। তবে, দ্রব্যের বদলে দ্রব্য বিনিময়ের বাটার সিস্টেম বহাল থাকলেও বেচা-কেনা বা ব্যবসার মোটাদাগের সূচনাটা হয়েছিল সামন্ত সমাজে । ভূমি ব্যবহারের বিনিময়ে ভূমি দাসত্বের সামন্ততন্ত্রে ভূমি ব্যবহারের গুরুত্ব বৃদ্ধি তথা ভূমিই উৎপাদনের প্রধান হাতিয়ার তথা মূল সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হওয়া এবং চাষাবাস সহ গৃহস্থালীর নানান উপকরণ আবশ্যক হওয়ায় সামন্ততন্ত্রে পণ্য উৎপাদন আরো প্রসারিত হয়। ফলে, সামন্ততন্ত্রেই গিল্ড এবং আধুনিক শিল্পের প্রাথমিকরূপ তথা যন্ত্র-পাতি সমৃদ্ধ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে উৎপন্ন পণ্য বিক্রির বাজার, পণ্য উৎপন্নে ও বিনিময়ে আধুনিক যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা এবং শিল্প মজুরদের আবশ্যকীয়তা দেখা দেয় এবং একই সাথে এসবের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে মানব যন্ত্র উৎপন্নে আধুনিক শিক্ষা শিল্পের ।

আবার, আধুনিক শিল্পের উপযোগী রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আবশ্যক হয়ে উঠে। অতঃপর, সামন্ত সমাজের ভূমি মালিকদের সাথে শিল্পমালিক ও পণ্য বিক্রেতা তথা ব্যবসাদার অর্থাৎ পুঁজিপতিদের বিরোধ দেখা দেয়। বিরোধে জড়িত উভয় শ্রেণীর স্বার্থের সংঘাতে সামন্ত সমাজের ধ্বংসস্তুপ হতে উত্থিত হয় আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ। কিন্তু, এটিও ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক ও শোষণ মূলক সমাজ বিধায় পরিবার প্রথা বহাল রাখে ।

তবে, পুঁজিতন্ত্রে পরিবার প্রথা বহাল থাকলেও পণ্য উৎপন্ন ও বেচা-কেনার কারণেই আধুনিক শিল্প কেন্দ্রীক নগর আর নগর কেন্দ্রীক অর্থনৈতিক তৎপরতা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রাম ক্রমাগত শহরে পরিণত হওয়ায় এবং অর্থনৈতিক ভাবে গ্রাম তথা কৃষি অর্থনীতি ক্রমাগত শিল্প অর্থনীতির নিকট গুরুত্ব হারানো ও নির্ভরশীল হওয়ার কারণে গ্রাম হতে শহরে আর এক শহর হতে আরেক শহরে বা একদেশ হতে আরেক দেশে সহজে যাতায়াত ও গমনাগমনের অবস্থা ও সুযোগ তৈরী হয়। এমনকি, শুরুর দিকে ইউরোপের বুর্জোয়ারা দেশ হতে দেশান্তরে ছুটে বেড়ায় এবং বিভিন্ন দেশে গেড়ে বসে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিমিত্তে। তাতে, জাত-জাতির গন্ডী পেরিয়ে বা এড়িয়ে ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভাষী বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে যেমন বিবাহ হতে থাকে তেমন সাবেকী পারিবারিক বাঁধন ও শিকল ভাংগতে ও শীতল হতে থাকে। তাতে, দেশ ভাংগতে ভাংগতে যেমন দেশের সংখ্যা বাড়তে থাকে তেমন পরিবারও ভাংগতে ভাংগতে পরিবারের সংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে তেমন পরিবারহীন জীবন যাপনের অবস্থা ও সুযোগও তৈরী হতে থাকে। অতঃপর, পারিবারিক সিদ্ধান্তে নয় সেক্সের সংগী নির্বাচনের প্রায়োগিক শর্ত ও সুযোগ সৃষ্টি

হয় নিজের পছন্দমতো অনেকেরই। ফলে, পুঁজিতন্ত্রে নতুন করে অবাধ প্রেম ও মুক্ত সেক্সের দাবী সামনে আসে।

পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতি তথা আধুনিক শিল্প নারীদেরকে ঘরের বাইরে টেনে এনেছে। ফলে,মহলে বন্দি অভিশপ্ত জীবনের অধিকারী হেতু মহল হতে বের হতে একদা নিষিদ্ধ মহিলা তথা নারী এখন কাজের কারণে দুনিয়ার যে কোনো স্থানেই কেবল যাতায়তই করে না বরং বসবাস করে একাকীও এবং একই কর্মস্থলে পুরুষদের সাথে কাজও করে। নারীরা যেমন আয় করে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পেল তেমন একদা পরিবারের উপর নির্ভর করে কৃষি তথা গ্রাম্য অর্থনীতির গন্ডীতে স্থানীকতা বা আঞ্চলিকতার এবং পারিবারিক কুপমন্ডুকতার বোধে জীবন যাপন করা পুরুষেরাও দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায় , কাজ করে , আয় করে এবং থাকে বটে নিজের আয় অনুযায়ী নিজের বাড়ী, বা ভাড়া বাড়ী বা ম্যাস বা গেষ্ট হাউস বা হোস্টেল বা হোটেল বা কলোনীতে আবার কেহ কেহ নগরীর রাস্তার পাশে এবং কেহ কেহ থাকে বটে একাকীও।

সামন্ততন্ত্রেও রান্না সহ গৃহ কর্ম যা ছিল কেবল্ই নারীর কাজ তা পুঁজিতন্ত্রে করা লাগছে বটে পুরুষকেও । আবার,সহ শিক্ষা, একই পরিবারের সদস্য না হয়েও নারী-পুরুষের একত্র বাস তথা গেস্ট হাউস বা এজাতীয় আবাসে বসবাস এবং পেশাগত কারণেই অনেকটা অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ পেয়েছে উপরন্ত শরীর ও সেক্স বিষয়ে হালের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা সূত্র ও তথ্য, এবং সেই রকম চিন্তা ও চেতনার প্রসারের হেতুবাদে সেক্সের বিষয়েও সাবেকী ধ্যান-ধারণার বদলে নতুন নতুন ধারণা সম্বলিত এলজিবিটি র্যাইট সহ একাকী বসবাসের সুযোগও তৈরী হচ্ছে বলে বেশ কিছু রাষ্ট্র

এলজিবিটি রাইটকে আইনত স্বীকার করে নিয়েছে আবার সারোগেসি, ক্লোনিং, টেস্ট টিউব পদ্ধতি ইত্যাদি সহ সন্তান উৎপাদন বিষয়ক নানান নতুন নতুন ধারণা ও পদ্ধতি সহ সেক্সসুয়াল ইভেন্টের ক্ষেত্রে বলা চলে আধুনিক রোবটিক বা নেট সেক্স সহ সেক্স বিষয়ে নানান নতুন নতুন ধারণার জন্ম হচ্ছে এবং সেসব ধারণা প্রয়োগের সুযোগও হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রে। আবার, নিজের পছন্দমতো জীবন যাপনের সুযোগ নিতে সন্তান জন্মদানেও আগ্রহী নয় অনেকেই আর বার্ধক্যে সন্তানদের উপরে নির্ভর করে বেঁচে থাকার সাবেকী বোধ কেবলই হ্রাস পাচ্ছে না বরং কর্ম ব্যস্ত বা কর্মসূত্রে দূর-দূরান্তে থাকা সন্তানদের বোঝা না হয়ে বেঁচে থাকতে পুঁজিতন্ত্রেই সৃষ্ট বৃদ্ধাবাস হয়ে উঠেছে বুড়োদের বিকল্প বাসস্থান। ফলে, বার্ধক্যে সন্তান নির্ভরতার জীবনের বোধ হতে মুক্ত থাকার বোধও সৃষ্টি করছে বটে পুঁজিতন্ত্র।

ফলে, সন্তান জন্ম দান সহ দাস ও সামন্ত সমাজে যেমন কেবল নারী-পুরুষের সেক্সকে একটি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম বলে জাহির করা হয়েছিল তা কেবল ভুলই প্রমাণিত হচ্ছে না বরং ওরকম বোধ যে শাসকদের বানানো রাজনৈতিক বোধ তাই, কৃত্রিমবোধ তাও নিশ্চিত ও পরিত্যাজ্য হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রের কঠিন বাস্তবতার হেতুবাদে। ফলে, জাপান সহ নানান দেশে বিয়ের হার যেমন ভয়ানকরকমভাবে কমে গেছে তেমন এমনকি ঢাকা শহরেও নারী কর্তৃক তালাক প্রদানের হারও যথেষ্ঠ মাত্রায় বেড়েছে। আর পরিবারতো ভাংগছেই সাথে ভাংগছে এবং পরিত্যাক্ত হচ্ছে বটে পারিবারিক মূল্যবোধ তথা উর্দ্ধতনের প্রতি অধস্তনের শর্তহীন আনুগত্য । অতঃপর, আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের সুযোগ-সুবিধায় বেড়ে উঠা ব্যক্তি তা হোক সে নারী বা পুরুষ কেবলই সেক্সের আকাংখায় আসলে যৌনতা বিষয়ে দাসযুগীয় বোধে তথাকথিত প্রেম-পীরিত করলেও বা বিবাহে আবদ্ধ হলেও

কথিত পরকিয়া তথা পছন্দমতো সংগী পাওয়া তা হোক কেবল সেক্সের জন্য তার হার কেবল বাড়েইনি বরং দিনে দিনে বাড়ছে এলজিবিটির ধারণা। ফলে, কেবল মাত্র নারী ও পুরুষের সেক্সেই কেবল সেক্স বা বিধিবদ্ধ ও পবিত্র সেক্স তাই, নারী মানেই সম্ভোগের সামগ্রী সেই সাবেকী ধারণা এখন নিম্নগামী।

যদিচ, পুঁজিতন্ত্রের সুবিধাভোগী শোষক পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণী নারীদের নিয়ে চরম বেলাল্লাপনা করেও একালের নারীদেরকে তারা কাজেও চায়, আবার ভোগেও চায় উপরন্ত অক্ষত যোনির সতী নারীও পেতে চায় বলে এবং সৎ ও সতী সাজার মুখোশের আড়ালে কুৎসিৎ মুখ লুকিয়ে রাখা স্ব-বিরোধী তথা দ্বিচারী নীতির বহুগামী পুঁজিপতিরা এবং এতদ্বিষয়ে মজুরদেরকেও বিভ্রান্ত করতে চায় বলে উত্তরাধিকার আইনে যেমন সংস্কার করেছে তেমন বিবাহ আইনেও অনেক রদ-বদল করতে বাধ্য হয়েছে পুঁজিতন্ত্রের শাসক শ্রেণী । ফলে, গে এন্ড লেজবিয়ানদের সেম সেক্স ম্যারেজও হচ্ছে এবং আইনসম্মতভাবে। তবু চরম প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণীর এক বিরাট অংশ নারীকে এখনো যৌন সামগ্রী হিসাবে প্রতিপন্নে এমনকি, রাস্তায়ও নারীদের অবাধ চলাচলে নানান প্রতিবন্ধকতা তৈরী করা সহ নানান ধরণের সাবেকী ড্রেস কোড মানানোর জন্য জোরদার অপচেষ্টা করছে।

দাস ও সামন্ত সমাজ ছিল স্থানীয় তবে দরিদ্র অর্থনীতির এক চরম অজ্ঞতা ও অন্ধত্বের সমাজ। তাই, এমনকি দাস মালিক ও ভূমি মালিকদের নিকট নারী দেহ সম্ভোগই ছিল বিনোদনের প্রধান উপায়। কারণ, এখনকার নানান খেলা-ধূলা, গল্প- উপন্যাস, নাটক-সিনেমা ও সিরিয়াল সহ বিনোদনের আধুনিক অসংখ্য বিষয় তখন ছিল না। কিন্তু, আজকে হাতের মোবাইলেও অনেক রকম খেলা-ধূলার সুযোগ

আছে। তাছাড়াও লাইফ স্ট্যাইলেও চলে এসেছে নানান নতুন নতুন বিষয় বা কাজের জন্য যেতে হচ্ছে নানান জায়গায়। তাছাড়া, আইসিটির কল্যাণে ও হালের বিশ্বমারী কভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাবে অফিসিয়াল কাজ সহ নানান কার্যাদি নিজ ঘরে বসে করার সুযোগে অনেক কর্মজীবী সহ বহু মানুষ সমচিন্তার বন্ধুরা সহ পেশা বা কাজের সূত্রে সংশ্লিষ্ট মানুষদের সাথে জীবন্ত যোগাযোগ রাখা সহ নানান বিনোদনমূলক কাজেও সময় অতিবাহিত করে। তাই, নিজ আবাসে থেকেও যুক্ত থাকছে বটে বাহিরের অনেকজনের সাথে অনেকজন এবং রাতেও। তাইতো, বিনোদন হিসাবে প্রথাগত সেক্স বা কেবলই স্বামী-স্ত্রীর সেক্সুয়াল এক্টিভিটি ক্রমাগত গুরুত্ব হারাচ্ছে।

তাই, প্রায় অনড়- অচল তবে বৃক্ষ সুলব জীবনাচরণের দাস ও সামন্ত সমাজের আমলের মতো জীবনযাপন এখানে প্রায় অসম্ভব বরং পণ্য উৎপাদনী পদ্ধতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে পুরোনো অভ্যাস বা আচার-আচরণও পাল্টিয়ে পরিবর্তনের সাথে নিজেকেও পরিবর্তন করতে হচ্ছে কম-বেশ সকলকে। আর টিকে থাকার প্রতিযোগিতাতো নিত্য-নৈমত্তিক বিষয়। তাই, পুঁজিতন্ত্রে বিনোদনের সুযোগ যেমন বাড়ছে তেমন বিনোদনের সুযোগ নিতে হলেও প্রয়োজনীয় সময় ও অর্থ খরচ করতে হচ্ছে। আর তা করার জন্য যোগ্যতাতো একটাই আর সেটা হচ্ছে টাকা। বলা চলে কেবলই টাকার ধান্ধায় ঘুরা লোকগুলো একেকটা টাকার বৃক্ষে পরিণত হওয়ার চরম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থেকে ভয়ানক হিংস্র ও উন্মত্ত প্রাণীতে পরিণত হয়ে কার্যত টাকাওয়ালারা সমাজে হিংস্রতা ও উন্মত্ততা ছড়াচ্ছে।ফলে, তাদেরই সৃজিত ও বহালকৃত নীতিবোধ, আইন ইত্যাদি ভেংগে বা অমান্যে এমনকি, খোদ পার্লামেন্টে পর্ণগ্রাফী বিরোধী আইন প্রনয়ণ কালেও সংসদে বসে সাংসদদের কেহ কেহ

হাতের মোবাইলে পর্ণগ্রাফী দেখে বা পাড়ার রকে বসে গরীব ঘরের বেকারেরাও ক্রিকেট জুয়ায় আনন্দ খোঁজে সাথে বেআইনী আয়ও ।

মজুরেরা মজুরি বাবত টাকা পায় বটে কিন্তু তারা টাকাওয়ালা নয়। বিনিয়োজিত টাকা পুঁজি হিসাবে গণ্য হয়। তাই, পুঁজিপতিরা মূলত টাকারও মালিক বটে। মজুরদের একটা অংশ যারা উন্নত মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ততোধিক উন্নত মানের সার্টিফিকেট হাসিল করে চাকুরীর বিশ্ব বাজারে চরম প্রতিযোগিতা করতে পারে বা উঁচা মাইনের চাকুরেরা যারা মজুর হয়েও সাধারণত নিজেদেরকে মজুর না ভেবে বরং সমাজের আপার ক্লাসের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী হিসাবে উপস্থাপন করে সেইরকম স্বীয় শ্রেণী পরিচয় বিচ্যুত মজুরেরা ছাড়া বাকীদের অধিকাংশরা এমনকি টিভিতেও বিশ্ব কাপ ফুটবল খেলাও নিজের বাসায় বসে দেখার সুযোগ নিতে পারছে না। অনেক শিশুতো এখনো প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ হতেও বঞ্চিত। ড্রপ আউটের হারও কম নয়। আবার, শিশুরা সাধারণত পড়া-শুনার চেয়ে খেলা-ধূলায় অধিকতর আগ্রহী হয়। কিন্তু, যত বয়স বাড়ে ততই সমাজের কঠিন বাস্তবতা ও সমাজ শাসনের শিকলগুলো কেবল বুঝতে থাকে না বরং প্রতিটি কাজেই তারা যে শোষক-শাসকদের তৈরী নীতি-নৈতিকতা, সংস্কার -ঐতিহ্য ,প্রথা -সংস্কৃতি, আইন ও বিধি-বিধান ইত্যাদি দ্বারা নানান বাধা ও প্রতিবন্ধকতার যেমন মুখোমুখি হয় তেমন এসব নানান অপ্রয়োজনীয় , ক্ষতিকর এবং মানবিক বোধ বিকাশে প্রতিবন্ধক শৃংখলার শিকলে বন্দী তাও টের পেতে থাকে নানান দুর্ভোগের শিকার হয়ে। অতঃপর, এহেন সমাজ বাস্তবতাকে যারা জানে ও মানে তারা সমাজে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। আবার, কেহ কেহ সকল শিকল ভেংগে-গুড়িয়ে একটি শিকলমুক্ত সমাজ তথা পণ্য বিহীন, পুঁজি মুক্ত, তাই,

বেচা-কেনা মুক্ত ফলে শোষণ ও শাসন মুক্ত একটি অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজের চিন্তাও করে। তবে, পুঁজিতন্ত্র বিরোধী এরকম বিপ্লবী চিন্তার জন্ম দিচ্ছে বটে আধুনিক পণ্য উৎপাদনী পদ্ধতি তাও কিন্তু পুঁজিতন্ত্রী নিয়মে এবং স্ব-বিরোধীভাবে। অতঃপর, স্ব-বিরোধী পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতি নিজেই পুঁজিতন্ত্র বিরোধী যে সকল বোধের জন্ম দিচ্ছে সেকল বোধের সফল রূপায়নে পুঁজি বিনাশী ও পুঁজিতন্ত্র বিরোধী শক্তির জন্ম ও বিকাশতো করছে ও করবে বটে পুঁজিতন্ত্রই পুঁজিরই নিয়মে ও শর্তে।

পণ্য উৎপন্নে প্রত্যেক শ্রমিক তার নিজ নিজ কাজ অপরাপর শ্রমিকদের সাথে সমানতালে ও সহযোগিতামূলকভাবে সম্পাদন করেই একটি পণ্য উৎপন্ন করে এবং পণ্যও বিনিময় হয় বটে সমান মূল্যে তাই, শ্রম সমতাবাদী এবং শ্রমিকেরাও প্রত্যেকে পণ্য উৎপাদনে সমান গুরুত্বপূর্ণ । আবার পণ্য বিনিময়ে ক্রেতা-বিক্রেতা পণ্যটির দাম বিষয়ে সহমত না হলে কোনো পণ্যই বেচা-কেনা হয় না। তাই, কি পণ্য উৎপাদন আর কি পণ্য বেচা-কেনা উভয় ক্ষেত্রে সমতার নীতি কার্যকরী করছে বটে পণ্য তথা পুঁজি উৎপন্নের তবে বৈষম্য, বৈরীতা ও অসমতার সমাজ- পুঁজিতন্ত্র।

অতঃপর , পুঁজিতন্ত্রের অনুরূপ স্ববিরোধী ও বৈরীতাপূর্ণ নীতি চর্চার কারণে পুঁজি টিকে থাকার জন্য যা যা করছে তাতে পুঁজি বিনাশী ও পুঁজিতন্ত্রী সমাজ বিলোপনের জন্য পুঁজিতন্ত্রে সৃজিত ও বিকশিত নীতি সমূহের সফল রূপায়ণ ও বাস্তবায়নের উপযুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার যাবতীয় বোধ , ভিত্তি ও শর্ত তৈরী করার মাধ্যমে পুঁজি নিজেই দুনিয়াছাড়া হওয়ার রাস্তা তৈরী ও প্রশস্ত করছে এমনকি চিন্তার ক্ষেত্রেও তবে,অবশ্যই পুঁজিতন্ত্রী নিয়মেই।

সেজন্যই, পুঁজিতন্ত্রের পূর্বে কোনো সমাজে মানুষে মানুষে সমান তাই, সমতার কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার বৈজ্ঞানিক চিন্তা করারও সুযোগও ছিল না এমনকি , পুঁজিতন্ত্র পূর্ণ বিকশিত হয়ে ক্ষয়িষ্ণু সমাজে পরিণত হওয়ার আগে কমিউনিজম বিষয়ে কাল্পনিক মতামত, মতবাদ বা মতাদর্শের ভিত্তিতে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের সাহিত্য ও রাজনীতি চর্চা হয়েছে বটে কিন্তু, কমিউনিজমের বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়নি। অবশ্য, মানুষে মানুষে সমান একথা যে বুঝে না সে কিন্তু পুঁজির গোপন রহস্য তথা অপরিশোধিত শ্রম হচ্ছে পুঁজি তাও বুঝতে অক্ষম। অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রের বার্ধক্যের কালে পুঁজির কোড ও সমাজ পরিবর্তনের কোড আবিষ্কার করার মাধ্যমে কমিউনিস্ট তাই বিজ্ঞানী মার্কস কমিউনিজমের বিজ্ঞান আবিষ্কার করেন ।

উল্লেখ্য, কমিউনিজম একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ বলেই কমিউনিজমে সকলেই বিজ্ঞানী। তাই, কমিউনিজম প্রতিষ্ঠায় ক্রিয়াশীল ব্যক্তি তথা কমিউনিস্ট মাত্রই একজন বিজ্ঞানী । সুতরাং, পুঁজিতন্ত্রের কমিউনিস্টগণ কমিউনিজমের বিজ্ঞান বৈ ভিন্ন কোনো মতবাদ বা মতাদর্শের ভিত্তিতে কাজ করতে অযোগ্য।

উল্লেখ্য, স্ববিরোধীতার পুঁজিতন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিণতি– কমিউনিজম হচ্ছে সমানদের একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ। তাই, কমিউনিজমে মানুষে মানুষে কোনো ভাগ–বিভাজন ও বৈষম্য এবং বৈরীতা নাই। ফলে, বিলুপ্ত হবে রাষ্ট্র ও পরিবার তাই, কমিউনিজমে প্রতিটি মানুষ হবে মুক্ত ও স্বাধীন। সুতরাং, শোষণমূলক , শ্রেণী বিভক্ত , বৈষম্যমূলক তাই বিষাক্ত পুঁজিতন্ত্রী সমাজকে বিলুপ্ত করে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন,মুক্ত ও মানবিক সমাজ যা ব্যক্তিমালিকানা হতে উদ্ভূত সকল শিকল ও বন্ধন হতে মুক্ত তথা মানুষ কর্তৃক মানুষের তৈরীকৃত সকল

শিকল মুক্ত তাই, নতুন সমাজটি মানুষ কর্তৃক মানুষের শাসন মুক্ত। অতঃপর, সেই মুক্ত ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে একটি নিরন্তর শান্তি ও অনাবিল আনন্দের মানবিক জীবন মান অর্জনের চেষ্টা করার প্রচেষ্টারত স্বক্রিয় জীবনই হচ্ছে আজকের দিনে তথা পুঁজিতন্ত্রে অর্থবহ জীবন। সুতরাং, কমিউনিস্ট হতে পারা ও কমিউনিজমের জন্য কাজ করার জীবনই হচ্ছে আজকের যুগে সফল ও স্বার্থক জীবন। অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রে সফল ও স্বার্থক জীবন প্রেমী ও মুক্তি প্রত্যাশীরা কমিউনিস্ট হবেন, কমিউনিস্ট থাকবেন এবং কমিউনিজম প্রতিষ্ঠায় কাজ করবেন এমনটাই স্বাভাবিক নয় কি?

কিন্তু, শোষিত মজুরদের সকল ভোগান্তি তথা দুর্দশা–দুর্ভোগ ও কষ্টের কারণ বটে পুঁজি তথা পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতি অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তি এবং নিশ্চিত অনিশ্চয়তার সমাজ পুঁজিতন্ত্র পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই নিশ্চিতভাবে বিলীন তথা বিলুপ্ত হবে কেবলই মজুরদের কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে এরকম তত্ত্ব ও তথ্য তথা বিষয়াদি জেনেও যদি কোনো মজুর বা মুক্তিকামী ব্যক্তি কমিউনিস্ট বিপ্লবটি যেমন সন্নিকটে নয় তেমন পুঁজিতন্ত্রও এখনই বিলুপ্ত হচ্ছে না তাই, পুঁজি বিনাশী কাজ তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনের কাজে হয়তো বিরতি দিয়ে নয়তো পরে করার জন্য তা শিকেয় তুলে রেখে দিয়ে মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রে নিজের নিশ্চয়তা সমেত সুখ–শান্তি ও সমৃদ্ধি হাসিলে পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তি লাভে পুঁজি আহরণে পুঁজি নামক বিষ বৃক্ষের মূলে কেবলই জল সেচনে নিজেকে নিয়োজিত করে জীবনের সফলতা বা স্বার্থকতা পেতে চায় তেমন ব্যক্তি কি কেবলই বোকার হর্দ্দ ?

কোনো সন্দেহ নাই , পণ্য মুক্ত তাই বেচা–কেনা মুক্ত তাই পুঁজি মুক্ত ফলে শাসন– শোষণহীন অথচ চরম প্রাচুর্য্যের কমিউনিজমে

প্রত্যেকের পরিচয় কেবলই একজন মানুষ বৈ নারী বা পুরুষ নয়। তাই, কেহ কারো যৌনতার সামগ্রী নয় আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকছে না বিধায় বৈধ উত্তরাধিকার জন্মানোর বোধও তিরোহিত হয়ে সকল মানুষ এক বন্ধুত্বপূর্ণ, প্রেম ও ভালোবাসাময় জীবন যাপনে প্রত্যেকে প্রত্যেককে সহযোগিতা করে একটি একক ও অখন্ড তবে পরিপূর্ণ মানবিকবোধ সম্পন্ন এক মানবজাতি হিসাবে প্রকৃতিকে বিজয়ে সর্বাধিক কাজ করবে।

উল্লেখ্য, পরিবার ও পারিবারিক বোধের ভয়ানক বন্ধন তৈরী করেছিল দাস সমাজ। আর পারিবারিক বন্ধন ও পরিবার ভেংগে চুরমার করছে পুঁজিতন্ত্র। অতঃপর, মানুষ কর্তৃক মানুষকে বাঁধার বা তেমন কোনো বন্ধনের বোধ ও নীতি সমূলে বাতিল ও বিলীন করে রাষ্ট্র সমেত খোদ পরিবারকে বিলীন করবে বটে পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তি হীন ও পুঁজিমুক্ত সমাজ- কমিউনিজম প্রতিষ্ঠাকারী মজুর শ্রেণী তবে বুর্জোয়াশ্রেণীর চাপিয়ে দেওয়া কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে তাই, কমিউনিজম হচ্ছে পুঁজির জন্মসূত্রে বিরোধে জড়িত শোষক পুঁজিপতি শ্রেণী ও শোষিত মজুর শ্রেণীর বিরোধের পরিণতি। অতঃপর,পুঁজির জন্মসূত্রের বিরোধে জড়িত পুঁজিপতি শ্রেণী ও মজুর শ্রেণীর চূড়ান্ত বিরোধ তথা কমিউনিস্ট বিপ্লবের ফলাফল হচ্ছে পুঁজিমুক্ত অত্যাধুনিক সমাজ-কমিউনিজম। সুতরাং, পুঁজিতন্ত্রে সৃষ্ট পরিবার বিনাশী ও বিলুপ্তির বোধের সফল বাস্তবায়নই হচ্ছে ব্যক্তিকে সমাজের বেসিক ইউনিট হিসাবে চিহ্নিত ও গণ্য করার যোগ্য ও উপযুক্ত সমাজ- কমিউনিজম।

আবার, নবজাতক জন্মানোর প্রথাগত পদ্ধতি বলা চলে অকার্যকর হবে আর মানুষের মরণকে ঠেকানোর ঘোষণাতো অলরেডি

বিজ্ঞানীরা করেই ফেলেছেন। ফলে, সন্তান গর্ভে ধারণ ও জন্মানোর জন্য কাউকে নারী হিসাবে চিহ্নিত বা গণ্য করার আবশ্যকতা থাকবে কি? উল্লেখ্য, যে বোধ সমগ্র মানবজাতিকে একই সূত্রে এবং এক অবিভাজ্য ও অখন্ডভাবে বিবেচনা করে বিধায় মানব জাতির প্রত্যেক সদস্য প্রত্যেকেই পুরো মানবজাতির সকলকে সমভাবে অনুভব করবে সেই ফেলো ফিলিং তথা সমবোধের বোধ হচ্ছে মানবিকবোধ। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে কেহই শ্রেণী ও শ্রেণী স্বার্থ হতে মুক্ত নয় । তাই, শ্রেণী বিভক্ত পুঁজিতন্ত্রেও কেহই মানবিক বোধ সম্পন্ন মানুষ নয় বরং প্রত্যেকেই কোনো না কোনো শ্রেণীর সদস্য হিসাবে স্বীয় শ্রেণীর শ্রেণী স্বার্থে পরিচালিত বিধায় পুঁজিতন্ত্রে প্রত্যেকেই শ্রেণীবোধ সম্পন্ন । তাই, শ্রেণী মুক্ত কমিউনিজমেই মানুষ প্রথম পরিপূর্ণ মানবিকবোধ সম্পন্ন মানুষ তথা প্রকৃত মানুষ হবে।

অতঃপর, অমানবিক পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে ইতিহাসে প্রথম বৈশ্বিক সমাজ আর বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রের শেষ গন্তব্য হচ্ছে পুঁজিতন্ত্র বিলীনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত একটি বৈশ্বিক তবে পরিপূর্ণ মানবিক বোধ সম্পন্ন প্রকৃত মানুষদের একটি মানবিক সমাজ– কমিউনিজম যে সমাজে প্রত্যেক সক্ষম মানুষ তার ক্ষমতামতো সমাজের জন্য কাজ করবে আর প্রত্যেকেই সমাজের তহবিল হতে তার ভোগ– ব্যবহারের জন্য আবশ্যকীয় জিনিষপত্র গ্রহণ করে নিরাপদে, অনাবিল শান্তিতে ও চিরানন্দে নিশ্চিত জীবন যাপন করবে প্রকৃতি বিজয়ে কাজ করতে । আর শিশুরা? সমাজের নিকট হতে আবশ্যকীয় সকল সুযোগ–সুবিধা নিয়ে তাদের শরীর পূর্ণ বিকশিত ও পরিপূর্ণ এবং পরিপক্ক হওয়ার আগে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো কাজ এমনকি সামাজিক তথ্য ভান্ডার হতে পেশাগত তথ্য সংগ্রহ করে ভবিষ্যতের পেশার প্রস্তুতি নেওয়াও

অনাবশ্যক। দেহগতভাবে পূর্ণ বিকশিত ও পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি শিশু খেলা–ধূলা করে আনন্দ –উল্লাস ও ফুর্তিতে কাটাবে।

কিন্তু, অমানবিকতার পুঁজিতন্ত্রে? কেবল প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগিতা আর প্রতিযোগিতা করেই টিকে থাকা বলা চলে এক অমানবিক জীবন যাপনে বাধ্য হয়ে মরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করা। এরূপ প্রতিযোগিতার ফলাফলও হিসাবযোগ্য। আবার , অসমপ্রতিযোগিতায় সেরা হতে বা বিজয়ী হয়ে পুঁজি শিকারী ও পুঁজি লোভীরা যে কোনো প্রকারে বিজয়ী হতে গিয়ে পুঁজিতন্ত্রেও যা অপরাধ বা নিষিদ্ধ কাজ সেসব দুস্কর্ম তথা মিথ্যাচার, জালিয়াতি, প্রতারণা, ব্ল্যাক মেইলিং, ভন্ডামি, চুরি, ডাকাতি, জবর–দখল বা বেদখল ইত্যকার নানান কর্মে জড়িত হয়। আসলে, পুঁজিতন্ত্রী আইন–বিধিতে নিষিদ্ধ বা দন্ডনীয় হলেও এসবই কিন্তু পুঁজিতন্ত্রী সমাজেরই বাই–প্রোডাক্ট যেমনটা অন্যায্য ও অন্যায় ব্যক্তিমালিকানার বাই–প্রোডাক্ট হিসাবে শাসকদের আইন ভংগ করে সংঘটিত করা কাজকে শাসকদের বিধানে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত ও গণ্য করেছে হেতু এরকম নানান অপরাধ দাস যুগ হতেই চালু হয়েছে।তাই, যতই শাসকেরা চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা , জালিয়াতি, লুট–পাট, অবৈধ দখল বা জবর দখল ইত্যাদি হতে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে তথা পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তিকে নিরাপদ রাখতে বা করতে যতরকমের আইনই করুক না কেন পুঁজিতন্ত্রী শোষণের ফল তাই,অন্যায় ও অন্যায্য পুঁজির কারণেই পুঁজিতন্ত্রে এসব কার্যাদি আছেই।এক্ষেত্রেও পুঁজিতন্ত্রী সমাজ একটা স্ব–বিরোধী সমাজ।তবে,এসব স্ববিরোধীতার হিসাব ঠিক–ঠাকমতো কষার জন্য বৈজ্ঞানিক বোধ আবশ্যক।

উল্লেখ্য, বৈজ্ঞানিক বোধ হচ্ছে সেই বোধ যে বোধ কোনো রাজনৈতিক কারণে সৃষ্টি হয়নি তাই যে বোধে কোনো রাজনীতি নাই, যে বোধে কোনো কৃত্রিমতা নাই, যে বোধে কোনো অসত্যতা বা সংকীর্ণ স্বার্থান্ধতা নাই অতঃপর, যে বোধে সার্বজনীনতা বৈ ভিন্ন কিছু নাই , যে বোধে সত্যতা বৈ মিথ্যা বা কৃত্রিমতার প্রতি কোনো মোহ নাই তথা প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত প্রাণ ও প্রাণী এবং প্রাণীদের বিশেষত মানুষদের জীবন ও সমাজ বিষয়ে যথার্থ বোধ অর্থাৎ এগুলোকে খোলা চোখে দেখা বৈ কোনো সংকীর্ণ স্বার্থে বা রাজনৈতিক চশমা সহ কোনো প্রকার চশমা পরে নয় বা কোনো প্রকার মতান্ধতার অনুসরণে নয় বরং একদম খোলা চোখে খোলাখুলিভাবে এসব বিষয়কে সর্ব দিক হতে সর্বতোভাবে ও যথার্থভাবে দেখা তথা যা বস্তুত বাস্তব অর্থাৎ বিষয়টি ঠিক যাহা ঠিক তাহাই বস্তুগতভাবে তথা ঠিক-ঠাকভাবে উপস্থাপনে ঠিক-ঠাকমতো দেখা, এবং সেজন্য ঠিকমতো পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা, পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ করে বিষয়গুলোকে প্রত্যেক দিক হতে পুনঃপুন পরীক্ষা -নিরীক্ষা করে প্রকৃত সত্যে তথা বিবৃত বিষয়টি ঠিক যাহা, ঠিক তাহা হিসাবে বিবৃত করা এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও গবেষণা বৈজ্ঞানিকভাবে করে প্রাপ্ত ফলাফল পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি দ্বারা মিলিয়ে তথা তুল্য মূল্যে মূল্যায়ন করে মূল্যায়িত ফলাফল বিষয়ে তথা বিবৃত বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে বলা বৈ কোনো প্রকার কল্পনা নির্ভর বা অবস্তুগত বা বানোয়াটি বা অসত্য বক্তব্য না বলা অর্থাৎ যে সত্য মিথ্যা হওয়ার সুযোগহীন সে সত্যই যে প্রকৃত সত্য তা স্বীকার ও গ্রাহ্য করার মাধ্যমে যে কোনো বস্তু বা ঘটনাকে ঠিক তেমনভাবেই বিবৃত করা যাতে প্রকৃতই বস্তুটি বা ঘটনাটি যেমন ঠিক তেমনভাবেই উপস্থাপিত হয় সেই রকম বোধ অতঃপর, কোনো বিষয়ে যথার্থভাবে তথা বৈজ্ঞানিকভাবে দেখা-

শুনা, জানা-বুঝা আর জেনে-বুঝে সেই বিষয়ে যথার্থ তথা প্রকৃত সত্যকে স্বীকার, গ্রাহ্য , মান্য ও আবশ্যকীয় ক্ষেত্রে অনুশীলন বা প্রয়োগ করার যে বোধ সেই বোধ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক বোধ।

উল্লেখ্য, অপরিশোধিত শ্রম হচ্ছে পুঁজি তাই, পুঁজি হচ্ছে শোষণের ফল। অতঃপর, পুঁজি বিষয়ে এরকম সূত্রায়ন বা বিবৃতি বৈ যে বোধে পুঁজি বিষয়ে ভিন্ন কিছু বুঝায় বা বলে তেমন কোনো বোধ বৈজ্ঞানিক বোধ নয়। এক বাক্যে বিজ্ঞান হচ্ছে মিথ্যা হওয়ার সুযোগহীন একটি সত্য। তাই, সত্য বৈ মিথ্যা বা অসত্য বা ভুয়া কিছু বলতে যেমন বিজ্ঞানীরা অযোগ্য তেমন কমিউনিস্টরাও বিজ্ঞান বৈ কোনো মতাদর্শ ভিত্তিক কোনো বক্তব্য বা কমিউনিস্টদের লক্ষ্য ও নীতি বিষয়ে ঠিক-ঠাক বক্তব্য তথা কমিউনিজমের বিজ্ঞানের বোধে ও ভিত্তিতে বৈ ভিন্ন বা পৃথক কিছু বলতে যেমন অযোগ্য তেমন কমিউনিস্টরা বিজ্ঞানী বলেই কমিউনিস্ট আন্দোলনে তথা বন্ধুদের সাথে মিথ্যা বা অসত্য বা ভুয়া বা কৃত্রিম বা কোনো বিষয়ে না জেনে সেই বিষয়ে কিছু বলতে অযোগ্য।

উল্লেখ্য, পুঁজিতন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিণতি -কমিউনিজম যেহেতু শোষণ-শাসন মুক্ত তাই, রাজনীতি ও মতাদর্শ বা এরকম বানোয়াটি ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বোধ মুক্ত একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ। অতঃপর, কমিউনিজমে প্রত্যেকেই বিজ্ঞানী তথা বৈজ্ঞানিক বোধ সম্পন্ন মানুষ । ফলে, ব্যক্তিমালিকানা হতে উদ্ভূত ও ব্যক্তি মালিকানার স্বার্থে সৃজিত সকল প্রকার মতাদর্শ, দর্শন, রাজনীতি হতে কমিউনিজম যেমন মুক্ত তেমন সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থপরতায় বা স্বার্থান্ধতায় বা অপরকে ঠকাতে বা ফাঁকি দিয়ে নিছক ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলে ব্যক্তি মালিকানা হতে উদ্ভাবিত ও চালুকৃত মিথ্যা ও অসত্য বা মতান্ধতা প্রসূত মিথ্যাচার

ইত্যকার কদাকার জঞ্জাল হতে মুক্ত কমিউনিজমের মানুষেরা হবে মিথ্যা বা অসত্যের সাথে পরিচয়হীন মানুষ। তাই, কমিউনিজমের মানুষেরা অর্থাৎ কমিউনিস্টরা মিথ্যাচার, ভুয়ামি–চাতুরী, প্রতারণা ও ভন্ডামি হতে মুক্ত সহজ–সরল ও সত্যানুসন্ধানী মানুষ।

কিন্তু, পুঁজিতন্ত্র? সম্পূর্ণত অন্যায় , অন্যায্য ও অযৌক্তিক ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক শ্রেণী বিভক্ত এক সমাজ বলে পুঁজিপতিরা এমনকি পুঁজি বিষয়ে মিথ্যাচার করে সমগ্র সমাজটাকে মিথ্যায় কেবল্ ভরেই তুলছে না বরং মিথ্যা ভিত্তির উপর দাঁড়ানো পুঁজিতন্ত্রকে চিরস্থায়ী ও চিরকালীন একটি ব্যবস্থা হিসাবে প্রোপাগান্ডা চালাতে গিয়ে তারা তাদের নিজেদের উত্থানের ইতিহাসকেই কেবল অস্বীকার করেনি বরং অতীতের ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক তথা শোষণ–শাসন ভিত্তিক শ্রেণী বিভক্ত সমাজ – দাস ও সামন্ত সমাজের বিলুপ্তির প্রকৃত ঘটনা তথা ইতিহাসকে আড়াল ও অস্বীকার করে কেবল পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্র বিষয়ে নয় বরং ব্যক্তিমালিকানার অন্যায্যতা, অযৌক্তিকতা ও চিরস্থায়ী না হওয়ার বিষয়টিকে আড়াল ও গোপন করার অপচেষ্টা করে পুঁজিপতিরা চিরকালীন শোষক –শাসক থাকতে অপতৎপরতা চালাচ্ছে। এরূপ অপতৎপরতার অংশ হিসাবে এরা রাষ্ট্রীয় মালিকানাকে চরম অসত্যভাবে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা বলে কার্যত সমাজ ও রাষ্ট্র বিষয়ে যেমন অসত্য বলছে তথা মিথ্যাচার করছে তেমন পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বিষয়েও মিথ্যাচার করছে। তবে, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অক্ষম ও অযোগ্য পুঁজিপতি শ্রেণী সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতাই নিশ্চিত করেছে আর রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রকে সমাজতন্ত্র বলে জাহির করতে গিয়ে পুঁজিতন্ত্রের অকার্যকারিতা , অস্থায়ীত্ব ও বিলুপ্তির প্রশ্নটিকেও সামনে

এনে পুঁজিপতি শ্রেণী নিজের অজ্ঞাতেই নিজের অপ্রয়োজনীয়তা ও বিলুপ্তির কথাটাও কার্যত কবুল করেছে।

পুঁজিতন্ত্রী শোষকদের গ্যাং লিডার লেনিন হচ্ছেন রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রীদের মহাগুরু । কোনো সন্দেহ নাই, রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে চরম নিকৃষ্ট পুঁজিতন্ত্রের একটা নিকৃষ্টতম রূপ যেখানে প্রথাগত পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্র হতে শোষণের হার যেমন বেশী তেমন দমন–পীড়ন ও নির্যাতনের ধরণ – ধারণ, ভয়ংকরতা –নৃশংসতা ও তীব্রতা এবং প্রকটতা , প্রভাব ও ব্যাপকতাও বেশী। ফলে, এসব লেনিনবাদী রাজনীতিকেরা মিথ্যাচার, হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতার কদাকার বিশ্রী কাজে কেবল বেশী বেশী মাত্রায় সক্ষম ও পারংগমই নয় বরং বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মিথ্যাচারী বলেই রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের রাজনৈতিক ভৃত্য কথিত সর্ব কমরেড স্তালিন, মাও, কিম , পল পট, হোক্সা, প্রমূখ লেনিনবাদী মোড়লেরা সহযোগী কমরেড হত্যা করা সহ দুনিয়ার জঘন্যতম হত্যাকারী এবং হিংস্র, কুৎসিৎ,কদাকার ও বর্বর শাসক ও অত্যাচারীদের তালিকার প্রথম দিককার স্থান দখলকারী।

পণ্যে নিষিক্ত শ্রম যেহেতু পণ্য মূল্য সেহেতু যত কম শ্রমে অর্থাৎ যান্ত্রিক উপায়ে পণ্য উৎপাদন করা যায় তত কম খরচে পণ্য উৎপাদন করে কম মূল্যে পণ্য বাজারজাত করা যায় । তাই, অসমপ্রতিযোগিতার বিশ্ব বাজারে টিকে থাকতে পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীকে উৎপাদনের যন্ত্রপাতির অবিরাম বিপ্লবীকরণ করা বৈ বিকল্প নাই। অতঃপর, পুঁজিপতি শ্রেণী নিজের অস্তিত্বের শর্তে পণ্য উৎপাদনী যন্ত্রপাতির যেমন ক্রমাগত ও বিরতিহীন বৈপ্লবীকরণ করছে তেমন পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির নবীকরণ, উন্নতকরণ ও বিপ্লবীকরণ করতে হচ্ছে। ফলে, হালের রোবট,

ড্রোন, নেট সহ অত্যাধুনিক নানান যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ইত্যাদি পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্বের শর্তাধীনে আবিষ্কার ও উদ্ভাবিত হয়েছে ও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। এবং হবে বটে পুঁজিপতি শ্রেণীর ইচ্ছে বা অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে কেবলই পুঁজিতন্ত্রী নিয়মে।

কিন্তু, ক্রমাগত উন্নত হতে উন্নততর যে সকল যন্ত্রপাতি বা প্রযুক্তি আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত হচ্ছে তা কি পুঁজিপতি শ্রেণী যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারছে, না পারবে? পুঁজিপতি শ্রেণী যদি সমগ্র পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতিটাকে রোবটিক করতে চায় এবং যদি তা করে তবেতো মজুরির বিনিময়ে মজুরের শ্রম–শক্তি ক্রয় করা লাগবে না । তাতে, প্রায় সকল মজুর বেকার হবে। ফলে, বেকারে ভরা দুনিয়ার বেকারদের নিকট টাকাও থাকবে না। তাই, বেকারেরা কোনো পণ্য ক্রয় করতে পারবে না বিধায় পণ্য বিক্রেতারাও পণ্য বিক্রি করতে পারবে না। ফলে, পণ্য ক্রয়–বিক্রয়ে যারা জড়িত ছিল তারাও বেকার এবং একই কারণে পণ্য পরিবহণ ও যোগাযোগে যারা জড়িত তারাও বেকার হবে। ফলে, এরা কেহ পণ্য ক্রয় ও ভোগ – ব্যবহার করতে পারবে না কারণ তারা বেকার বলে তাদের নিকট টাকা থাকার সুযোগ নাই।

অথচ, পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে বেচা–কেনা ভিত্তিক অগণন পণ্য উৎপন্নকারী একটি সমাজ অতঃপর, পুঁজিতন্ত্র আছে তাই পণ্য আছে কিন্তু বেচা–কেনা নাই, তখন পণ্যের মালিক– পুঁজিপতিদের কি অবস্থা হবে? সন্দেহাতীতভাবে, খোদ পুঁজিপতিরাই রোবটিক উৎপাদনে বিনিয়োগকৃত পুঁজি হারাবে। ফলে, পুঁজি ও পুঁজিপতিরা ভয়ানক সংকট ও সমস্যায় নিপতীত হবে যা পুঁজিতন্ত্রে সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু, কষ্টকর ও ঝুঁকিপূর্ণ ক্রিয়াদি সম্পন্নকরণ সহ মনুষ্য প্রজাতিকে

ঝুঁকিপূর্ণ ও কঠোর শ্রমের কষ্টকরতা ও বিড়ম্বনা এবং ঝক্কি-ঝামেলা হতে রেহাই দিয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক ও অত্যন্ত উন্নততর যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে খুবই হালকা শ্রমে উৎপাদনী কার্যাদি সম্পন্নকরণে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ারাদির উপযুক্ত উন্নতকরণ ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সুযোগ-সুবিধা ও অবস্থাতো খোদ পুঁজিপতিরাই রোবোটিক যন্ত্র সহ আরো অন্যান্য হাতিয়ারাদি ইতোমধ্যে তৈরী করার মাধ্যমে নিশ্চিত করেছে।

কিন্তু, রোবট, নেট ইত্যাদি সহ পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ে এখনই যে সব অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণী পণ্য উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করেছে সেগুলোর কার্যক্ষমতা যেমন বেশী তেমন এগুলোর ব্যাপকতা ও বিস্তৃতিও সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার মধ্যেতো নয়ই এমনকি কোনো দেশ বা রাষ্ট্র বিশেষেও সীমিত রাখার সুযোগহীন। কারণ, এসব বিষয়গুলো ইতোমধ্যে নিজেরাই নিজেদের ব্যাপ্তি, বিস্তৃতি ও পরিধি বিশ্বময় করে নিয়েছে যা পুঁজিতন্ত্রী সমাজের ভিত্তিমূল- ব্যক্তিমালিকানার সাথে বৈরীতো বটেই এমনকি, রাষ্ট্রিক এবং বহুজাতিক কোম্পানী মালিকানার সাথেও সাংঘর্ষিক, বৈরী ,অসামঞ্জস্যপূর্ণ আর বেমানানতো বটেই। অতঃপর, উৎপাদন, পরিবহন ও যোগাযোগের উল্লেখিত ক্ষমতাধর হাতিয়ারাদির উপযুক্ত ও যোগ্য ব্যবহারের নিমিত্তে যতক্ষণ না সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততক্ষণ পুঁজিতান্ত্রিক সংকট ও সমস্যা থেকেই যাচ্ছে বিধায় উৎপাদন ও বিনিময়ের আধুনিক উপায়াদির উপযুক্ত ও যুক্তিযুক্ত ব্যবহারের শর্ত পূরণে সামাজিক মালিকানার উপযোগিতা, আবশ্যকতা ও অনিবার্যতা তৈরী করছে বটে খোদ পুঁজিতন্ত্র।

মজুরদের সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন পণ্যের অতঃপর, পুঁজির মালিক হচ্ছে বটে পুঁজিপতিরা তাদের পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তির মালিকানার শর্তে তথা ব্যক্তিগত সম্পত্তিমূলে গঠিত পুঁজিতন্ত্রের নিয়ম ও বিধিতে । কিন্তু, মজুরদের সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন পণ্য অতঃপর, পুঁজির পুঁজিতন্ত্রী তথা ব্যক্তিগত মালিকানা হচ্ছে সম্পূর্ণত অযৌক্তিক, অন্যায়, ও অন্যায্য। অতঃপর, ভিত্তি মূলেই পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ কেবল স্ববিরোধী ও স্ববৈরীতাপূর্ণই নয় বরং টোটালী অযৌক্তিক একটি সমাজ তাই, পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে সকল প্রকার অন্যায়, অন্যায্যতা বা মন্দ কর্মের জন্মদাতা বা সূতিকাগার এবং সকল খারাপ কাজের ভান্ডার আর এসব খারাপ কাজের ভান্ডারী হচ্ছে শোষক পুঁজিপতি শ্রেণী বিধায় অন্যায্য পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তি ভিত্তিক অন্যায়ের ভিত্তিতে গড়ে উঠা পুঁজিতন্ত্রী সমাজ স্ববিরোধীতা ও নৈরাজ্যময় তাই অস্থির তবে হালে চরম সংকটাপন্ন এক অচল সমাজ। পুঁজির অন্যায় মালিকানা সহ পুঁজি হতে উদ্ভূত এসব বিষয়াদি জেনেও বা স্বীয় শ্রেণীর বিলুপ্তির তথা পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তি বিলোপের অন্যতম কারণ বটে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের জন্য সৃষ্ট নতুন নতুন ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি তবু সেসব জানা-বুঝা বিষয়কে পুঁজিলোভী পুঁজিতন্ত্রীরা তাদের করুণ পরিণতিকে মানতে অস্বীকৃত হয়ে পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্বের শর্তে পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তির অন্যায় ও অন্যায্য মালিকানাভোগী পুঁজিপতি শ্রেণী চাইলেও যেমন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি তৈরী বা উদ্ভাবন করা হতে বিরত হতে পারছে না তেমন যেসব অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি তৈরী করেছে সেসবও যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারছে না । কারণ, মন্দা।

ফলে, পুনঃপুন মন্দায় আক্রান্ত তবে মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রে অন্যায্য পুঁজিপতি শ্রেণী স্বীয় শাসনাধীন পুঁজিতন্ত্রী সমাজকে যথার্থভাবে

কার্যকর ও সচল রাখতেও ব্যর্থ হয়ে সমাজে নৈরাজ্য তৈরী করছে বহু বছর যাবৎ । তাই, পুঁজিপতি শ্রেণী নিজেই নিজের অযোগ্যতা, অক্ষমতা ও ব্যর্থতা নিশ্চিত করে শাসক শ্রেণী হিসাবেতো নয়ই এমনকি, একটি শ্রেণী হিসাবে অবস্থান করাটা যে সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও অনাবশ্যক তাও নিশ্চিত করেছে। তবু, লোভী পুঁজিপতি শ্রেণী সমাজের ক্ষতি করে হলেও টিকতে চায় বলে পুঁজিপতি শ্রেণী এমনকি বিজ্ঞান ছাড়া যখন এক কদম চলতে পারে না তখনও বিজ্ঞান বিরোধী তথা দাস ও সামন্ত সমাজের মাইথোলজিক্যাল কাহানী ও বোধ এবং মতান্ধতার নীতি চর্চা ও প্রসারণে বিপুল ব্যয় করছে।

কার্যত, অস্তিত্ব রক্ষায় পুঁজিপতি শ্রেণী উৎপাদনের যন্ত্রপাতির অবিরাম বিপ্লবীকরণ করতে গিয়ে ব্যক্তিমালিকানার সাথে সাংঘর্ষিক ও বৈরী সম্পর্কের তথা সামাজিক মালিকানার উপযোগী ও উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি তৈরী করতে বাধ্য হয়ে নিজেদের অজ্ঞাতে ও অজান্তে কার্যত স্বীয় শ্রেণীর অস্তিত্বহীনতার সকল আয়োজন ও আঞ্জাম করছে নিজেরই ইচ্ছে নিরপেক্ষেভাবে ও নিরুপায় হয়ে। ফলে, সমাজ শাসনে চরম ব্যর্থ , অযোগ্য ও অক্ষম পুঁজিপতি শ্রেণী টিকে থাকার অপপ্রয়াশে যতই প্রতিক্রিয়াশীলতার ও মতান্ধতার আশ্রয় নিয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে ব্যাহত ও বিঘ্নিত করুক না কেন কার্যত পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন ও বিনিময়ের উল্লেখিত হাতিয়ারাদির সাথে সম্পত্তির পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানার চরম বিরোধের যাঁতা কলে পড়ে খোদ পুঁজিপতি শ্রেণীই ক্রমাগতই কাটা-কুটি হচ্ছে পুঁজির অতি ধারালো করাতে যাকে বাংলা প্রবাদে বলে শাখের করাত। তাইতো, প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য মাত্র ৫১ হলেও হালে আই এম এফের সদস্য সংখ্যা-১১৮। অর্থাৎ, ডিফাংক্ট রাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করে সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হলেও কার্যত অকার্যকর রাষ্ট্র টিকে

থাকতে পারছে না বলেই ব্যর্থ রাষ্ট্রগুলো ভেংগে ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে রাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়াচ্ছে। একই কারণে রাজনৈতিক দল এবং পরিবার ভাংগার নজিরতো বেশুমার। প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদনী সক্ষমতাকে ব্যবহারে অযোগ্য পুঁজিতন্ত্রী সমাজটা ভেংগে-চুরে চৌচির হচ্ছে কার্যত বিলুপ্ত হওয়ার নিমিত্তে কার্যত ও মূলত পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্বের শর্তাদির হেতুবাদে।

অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের হাতিয়ারাদির সাথে পুঁজিতন্ত্রী মালিকানার উল্লেখিত বিরোধের পরিণতি- কমিউনিজমে যেমন পুঁজির স্বার্থাধীন কোনো বৈশ্বিক সংগঠন , রাষ্ট্র সহ কোনো রাজনৈতিক সংগঠন এবং পরিবার থাকার সুযোগ নাই তেমন সামাজিক উৎপাদন ও যোগাযোগে সমন্বয় ও কম্যুনিক্যাট করতে দুনিয়ার সকলের দ্বারা সকলের জন্য, সকলের একটি সামাজিক সংগঠন থাকলেও ব্যক্তি হচ্ছে সমাজের বেসিক ইউনিট তাতো নিশ্চিত করছে বটে পুঁজিতন্ত্রই।

পুঁজির সঞ্চালন মানে পণ্যকে টাকায় আবার টাকাকে পণ্যে আবার পণ্যকে টাকায় পরিণত করা অর্থাৎ বেচা-কেনা তথা ব্যবসা-বাণিজ্যের শর্তে পুঁজিপতি শ্রেণী যেমন আধুনিক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পত্তন ঘটিয়েছে তেমন ব্যাংকও প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলে, ঋণ বা ক্রেডিট ব্যবস্থার প্রচলন হল। তাতে, বিনিয়োগে উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা নিজ নিজ মালিকানাধীন পুঁজির ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশী বেড়ে গেল। ফলে, বৃহদায়তন ও শ্রম-ঘন শিল্পের যেমন প্রসার হল তেমন যোগাযোগ সহ পরিবহন ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হল। অন্যদিকে, পুঁজির কারণেই তথা পণ্য উৎপাদনী পদ্ধতির কারণেই শিল্পের তথা শহরের উপর নির্ভরশীল হতে হতে সাবেকী গ্রামীণ অর্থনীতি তথা প্রকৃতি নির্ভর, স্থানীয় ও বিচ্ছিন্ন এবং

গরীব অর্থনীতি ভেংগে -চুরে বিলীন করে বেচা-কেনা ভিত্তিক তথা বিশ্ব বাজার সমেত পুঁজিতন্ত্র একটি সমৃদ্ধ ও প্রাচুর্যময় বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল। শিল্পায়নের এই প্রক্রিয়ায় গ্রাম্য অর্থনীতির সাথে সাথে গ্রাম্যতাও লুপ্ত হতে থাকল। জমাটবাঁধা দৃঢ় পারিবারিক মূল্যবোধ সাবেকী বোধে পরিণত হচ্ছে দ্রুত গতিতে। তাতে, ঘোমটার নীচের খ্যামটা নাচ উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে অর্থাৎ পারিবারিক কর্তার কর্তৃত্বপরায়নতার বিভৎস ও কুৎসিৎ রূপ সামনে চলে এলো। ফলে, কর্তার প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যের পোষাকী রূপ তথাকথিত শ্রদ্ধার আবরণ কেবলই খসে পড়তে লাগল । পরিবার ভাংগার সেই যে হিড়িক পড়ল আর থামেনি। এভাবে, পরিবার ভাংগার ভিত্তি যোগান দিচ্ছে আধুনিক শিল্প ও শিল্প অর্থনীতি।

পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে ক্রেডিট ব্যবস্থায় পুঁজিপতি শ্রেণী যুক্ত করল জয়েন্ট স্টক কোম্পানী তথা শেয়ার মার্কেট যা একটা ফাটকা বাজারও বটে। তবে, এতে পণ্য উৎপাদন বা বিনিময় ব্যবস্থাপনার কোনো দায়-দায়িত্ব বহন না করে কিছু কুপনকাটা পরজীবী লোকের যেমন উদ্ভব হল তেমন পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনায়ও শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর অপ্রয়োজনীয়তাও নিশ্চিত করে এটাও নিশ্চিত করল যে পুঁজিপতি না হয়েও বা বেতনভুক কর্মচারীরাও ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব পালন করতে পারে বটে। আবার, শেয়ার মার্কেটই প্রথম পুঁজিতন্ত্রী ব্যক্তিমালিকানার সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করে সামাজিক শ্রমে পণ্য উৎপাদনী পদ্ধতি তথা ব্যক্তিগত মালিকানা মূলী পুঁজিতন্ত্রের মধ্যেই শেয়ার মার্কেটের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থাপনায় দায়-দায়িত্বহীন তবে জুয়াড়ী প্রবণতার শেয়ার হোল্ডারদের কাগজী তবে সম্মিলিত মালিকানার পত্তন করার মাধ্যমে শেয়ার বাজার হতে সংগৃহীত অর্থে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন বাড়াতে আধুনিক কল-কারখানা

প্রতিষ্ঠা করে পুঁজিপতি হিসাবে সক্ষমতা বাড়িয়ে পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে পুঁজি লোভী পুঁজিপতি শ্রেণী স্বয়ং ব্যক্তিমালিকানা বিরোধী ও বিনাশী সামাজিক মালিকানার সূচনা ও পত্তন করে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার সংকোচনের পথ তৈরী ও প্রশস্ত করছে।

অতঃপর, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিই ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপনের ও সামাজিক মালিকানার অবস্থা, শর্ত, ভিত্তি, সুযোগ ও অনিবার্যতা হাজির করেছে। ফলে, পুঁজিপতি শ্রেণীর সৃষ্ট মজুর শ্রেণী কার্যত পণ্য উৎপাদন পদ্ধতির পরিণতি– সামাজিক মালিকানার নতুন সমাজ– কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করবে এটাই স্বাভাবিক । কারণ, মজুর শ্রেণী হচ্ছে পুঁজির মালিকানাহীন তবে পুঁজি উৎপন্নকারী তাই, কেবল শোষিতই নয় বরং পুঁজির শিকলে বন্দী বিধায় চরম দুর্ভোগ ও দুর্দশা ভোগী তাইতো, মজুরেরা বিষাক্ত পুঁজিতন্ত্র হতে মুক্তি প্রত্যাশী । তবে, পুঁজিপতি শ্রেণীর সাথে পুঁজির জন্ম শর্তে বিরোধে লিপ্ত মজুর শ্রেণীই হচ্ছে একমাত্র শ্রেণী যে শ্রেণীটি তার শোষক–শাসক শ্রেণী– পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে হেতু পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামে লিপ্ত বলে শ্রেণী সংগ্রামী মজুর শ্রেণীই একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে অন্যায় ও অন্যায্য পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তিকে বিলীন করার মাধ্যমে পুঁজিপতি শ্রেণীকে চিরতরে বিলীন করার জন্য একমাত্র যোগ্য ও উপযুক্ত শ্রেণী। তাইতো, পুঁজিতন্ত্রে সুচিত ও বিকাশমান সামাজিক মালিকানা যা পুঁজিতন্ত্রী পদ্ধতিতে সৃষ্ট উৎপাদনের নতুন নতুন এবং অত্যাধুনিক ও বিপুল বিস্তৃতির বা প্রবল ক্ষমতার হাতিয়ারাদির যথাযথ ব্যবহারেও উপযুক্ত ও উপযোগী বলেই উৎপাদন, পরিবহন ও যোগাযোগের উপায়াদির সামাজিক মালিকানার সমাজ– কমিউনিজম ছাড়া যেমন পুঁজিতন্ত্রের বিদ্যমান যুদ্ধ বা যুদ্ধ–যুদ্ধ অবস্থা সহ তাবৎ সমস্যা সংকটের নিস্পত্তি হবে না তেমন মজুর

শ্রেণীও পুঁজিতন্ত্রের তাবৎ দুর্ভোগ ও দুর্দশা হতে মুক্ত হতে পারবে না। সুতরাং, পণ্য অতঃপর, পুঁজি উৎপন্নকারী মজুর শ্রেণী পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানাহীন শ্রেণী বলেই সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠায় উপযুক্ত ও যোগ্য শ্রেণী।

অতঃপর, উৎপাদনের অত্যাধুনিক হাতিয়ারাদি যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেদের যথাযথ ব্যবহারোপযোগী মালিকানায় তথা সামাজিক মালিকানায় নিপতিত হবে ততক্ষণ যেমন পুঁজিতন্ত্রের সমস্যা বিশেষত মন্দার সংকট চলতেই থাকবে । আবার, মন্দা বা পুঁজিতন্ত্রী সংকট ও সমস্যায় মজুর শ্রেণীও ক্রমাগত দুর্ভোগ–দুর্দশায় পতিত হবে। অন্যদিকে, উল্লেখিত মন্দা সংকট সহ পুঁজিতন্ত্রের নানান সংকট ও সমস্যায় ক্রমাগত জর্জরিত হয়ে নানান দ্বন্দ্ব– সংঘাতে পুঁজিপতি শ্রেণীও নানান ভাগে বিভক্ত হচ্ছে ও হবে যদিচ, মজুরদেরকে শোষণের বিষয়ে সকল পুঁজিপতিই এক ও অভিন্ন মনোভাব পোষণকারী। তবু, মন্দা তথা পুঁজির সংকটে নিপতীত ও নিমজ্জিত তাই, গভীর হতে গভীরতর সংকটের এবং তীব্র হতে তীব্রতর সমস্যার পুঁজিতন্ত্রে সামাজিক নৈরাজ্য হতে মুক্তি পাচ্ছে না কেহ।

যদিচ, পুঁজিপতি শ্রেণী স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে কেবল নতুন নতুন রাষ্ট্র বানিয়ে দুনিয়ার মজুরদেরকে দেশ–জাতি ও রাষ্ট্রের গন্ডিতে আটক ও ভাগ–বিভাগ ও বিচ্ছিন্নকরণের কাজটি করেছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও, রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয়ের পলিসি নির্ধারণে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে কার্যত বাতিল করে বিশ্ব অর্থনীতিকে একটি বৈশ্বিক কেন্দ্র হতে নিয়ন্ত্রণের জন্য আই এম এফ প্রতিষ্ঠা করেও মন্দার কবল হতে রেহাই পায়নি তবু বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মতো আরো নতুন নতুন বৈশ্বিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে পুঁজিপতি শ্রেণী এটাও নিশ্চিত করেছে যে

কার্যতই একটি রাষ্ট্রহীন তথা মুক্ত বিশ্ব বৈ রাষ্ট্রিক কাঠামো বজায় রেখে তথা পুঁজিতন্ত্রকে বহাল রেখে পুঁজিতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এমনকি, বিশ্ব ব্যাপী একক মুদ্রার প্রচলন বা একটি বিশ্ব রাষ্ট্র বা বিশ্ব সরকার ব্যবস্থার মতো কোনো ব্যবস্থার প্রবর্তন করেও পুঁজিতন্ত্রে সৃষ্ট মন্দা সহ পুঁজিতান্ত্রিক সমস্যাদির সমাধান সম্ভব নয়।

আবার পুঁজি উৎপন্নকারী মজুরেরাও দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ , লিঙগবাদ, ইত্যকার নানান বাদের মতাদর্শ ভিত্তিক রাজনীতি সহ লেনিনবাদী রাজনীতির মোহে বা আবেগে বা আছরে যতোই আচ্ছন্ন বা মোহগ্রস্ত হোক না কেন তারাও কিন্তু দেখছে যে যতোই তথাকথিত মুক্তির স্বপ্ন বেচে রাজনীতিকেরা যতসংখ্যক রাষ্ট্রই তৈরী করুক না কেন সেই রাজনীতিকরাই পুঁজির গোলাম হিসাবে পুঁজির প্রয়োজনে রাষ্ট্রকে ডিফ্যাংক্ট করে আই এম এফ , বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ইত্যাদির মতো নানান বৈশ্বিক সংস্থা গড়ে তুলে পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার রক্ষণা-বেক্ষণ ব্যয় বিপুল পরিমাণ বাড়িয়ে রাষ্ট্রগুলোকে কেবলই বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর স্থানীয় শাখায় পরিণত করে সরকারগুলো পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বহন করতে আই এম এফ সহ নানান বৈশ্বিক সংস্থার ব্যবস্থাপত্রমতো বিশেষত অর্থনীতি বিষয়ে কাজ করছেন । তবে, একতাহীন তথা দেশ-রাষ্ট্রে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন দুনিয়ার মজুরদেরকে দমন-পীড়নে সকল রাষ্ট্রই প্রবল ক্ষমতাধর আর সেই কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতা প্রয়োগে সরকারগুলোও বেশ দক্ষ ও পারংগম। উল্লেখ্য, রাষ্ট্র মজুরদের দমন-পীড়ন যাহাই করুক না কেন রাষ্ট্রের তাবৎ খরচের যোগান আসে কিন্তু মজুরদের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য হতে। যার টাকায় রাষ্ট্র চলে সেই মজুর শ্রেণীকে দমন-পীড়ন করে অর্থনৈতিক নীতি সমেত তাবৎ স্ববিরোধীতার যাঁতাকলে পিষ্ট

খোদ রাষ্ট্র বিলুপ্তির তথা রাষ্ট্রের অস্তিত্বহীনতার আবশ্যকতা মজুরদের নিকট নিশ্চিত করছে বটে সর্বশক্তিমান পুঁজির দাপুটে ক্ষমতা ।

অতঃপর, ব্যক্তিমালিকানার সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতার হেতুবাদে ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রকে রক্ষা করতে এত্তোসব করেও পুঁজিতন্ত্রকে সচল রাখতে অক্ষম, অযোগ্য ও ব্যর্থ পুঁজিপতি শ্রেণী টিকে থাকার জন্য যতই রাজনীতি করুক বা বিশ্ব সংস্থা গঠন করুক ততই কিন্তু দুনিয়ার মজুরদের দুর্ভোগ– দুর্দশা ও বন্দীদশা বাড়ছেই। ফলে, মজুরেরাও সুযোগ পাচ্ছে এমনকি রাজনীতি এবং রাষ্ট্র সমেত বিশ্ব সংস্থাগুলো বিষয়েও জানতে –বুঝতে। অতঃপর, এরকম বিষয়গুলো জেনে–বুঝে পুঁজিতন্ত্র বিলীনে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার মজুরদেরকে একতাবদ্ধকরণে মজুর শ্রেণীর একটি পার্টি গঠিত হলে দুনিয়ার মজুরেরাও তাদের মুক্তি যে তাদেরই বৈশ্বিক একতা ছাড়া অর্জিত হবে না তাও বুঝবে বটে সহজে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ বোধজাত অভিজ্ঞতায়। তাই, পুঁজিতান্ত্রিক সংকট হতে উত্তোরণে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রকে বিলীন করার মাধ্যমে মজুরদের মুক্তির জন্য কাজ করতে অর্থাৎ দুনিয়ার মজুরদেরকে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য একতাবদ্ধ করতে মজুরদের একটি পার্টি হচ্ছে এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা।

অতীতের শ্রেণী বিভক্ত, বর্বর, অন্ধকারাচ্ছন্ন, প্রকৃতি নির্ভর , স্থানীয় তবে খুবই দরিদ্র সমাজগুলোর সাথে তুলনায় বেশ আলোকিত, প্রকৃতি বশীকরণকারী, সমৃদ্ধ ও বৈশ্বিক ব্যবস্থার তবে শোষণমূলক – শ্রেণী বিভক্ত পুঁজিতন্ত্রী সমাজের পুঁজিপতি শ্রেণী কেবলই পুঁজির ধান্ধায় ঘুরে কেবলই পুঁজি আহরণে কেবলই অবিবেচকের মতো পূর্বাপর ফলাফল বিবেচনায় নিতে অক্ষম হয়ে পৃথিবীসহ প্রকৃতিকে

যেভাবে অপরিকল্পিতভাবে অন্ধের মতো ব্যবহার করেছে এবং শিল্পায়ন , পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পত্তন করেছে তাতে হালের বিশ্ব উষ্ণায়নের যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তাকে স্বল্পতম সময়ে যথাযথভাবে মোকাবেলা করে একটি বসবাসোপযোগী ধরিত্রী নিশ্চিত করতে উষ্ণায়নের জন্য দায়ী পুঁজিতন্ত্রী পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে ইচ্ছেকৃতভাবে আড়াল ও গোপন করে পুঁজিবাদী দুনিয়ার শাসকদের ক্লাবের সদস্যরা নানান সময়ে নানান বৈশ্বিক সম্মেলনে কার্যত পিকনিকে একত্রিত হয়ে কতিপয় দেশের উপর উষ্ণতার দায়ভার বর্তিয়ে তাদের নিকট হতে কিছু আদায় করে সেসবের কিছু পরিমাণ যে নির্ধারিত প্রকল্পে খরচ করে বাকীটা কেহ কেহ নিজেদের সাংগ-পাংগদের তহবিলে ভরে সেরকম খবরতো দেখাই যায়। কিন্তু, বিশ্ব উষ্ণায়ন কার্যত হ্রাস হয় না বা নিয়ন্ত্রণেও আসে না এবং আসা সম্ভবও নয়। কারণ , নানান রাষ্ট্রে বিভক্ত পৃথিবীতে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাত হচ্ছে-বাড়ছে এবং দ্বন্দ্ব হওয়া ও বাড়াটাই স্বাভাবিক। তাই, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিভক্ত,বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন পৃথিবীতে মানুষগুলোও নানান শ্রেণী ও নানান ভাগ-বিভাগে বিভক্ত-বিচ্ছিন্ন ও বৈরী সম্পর্কের অধীন। অথচ, বিশ্ব উষ্ণায়নের সমস্যাটি সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের সাধারণভাবে এক সাধারণ সমস্যা। তাই, এটি মোকাবেলা ও সমাধানে দুনিয়ার সকল মানুষের একত্র হয়ে একযোগে কাজ করা বৈ বিকল্প নাই। কিন্তু, পুঁজিতন্ত্র বহাল রেখে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তি দ্বারা অসংখ্য ভাগ-বিভাগে বিভক্ত- বিভাজিত মানুষেরাতো বিশ্ব উষ্ণায়ন কেন নিদেন পক্ষে একটি বিশ্বমারীর বিরুদ্ধে একযোগে দাঁড়াতে পারে না তাতো সম্প্রতিও প্রমাণিত। তাছাড়া, বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী পুঁজিতন্ত্রকে বহাল রেখে উষ্ণায়নের দুর্ভোগ হতে মানবজাতিকে রক্ষা

করা আর দেহে এইডসের জীবানু রেখে দিয়ে প্যারাসিটামল খেয়ে সুস্থ হওয়া বা মৃত্যুকে ঠেকানোর নিস্ফলা প্রচেষ্টা সমার্থক নয় কি?

অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রেরই নেতিবাচক ফল- বিশ্ব উষ্ণায়নের জটিল ও কঠিন সমস্যা মোকাবেলা এবং সমগ্র মানবজাতিকে এক ও অভিন্ন এবং একক সত্ত্বা হিসাবে এ্যাক্ট-রি্এ্যাক্ট করতে হলেও এবং যা করা আবশ্যক তা পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার বিলুপ্তি এবং রাষ্ট্র সহ পুঁজিতন্ত্রীদের সংকীর্ণ স্বার্থে পুঁজিতন্ত্রীদের সৃষ্ট ও লালিত-পালিত বা পরিপোষিত বা পৃষ্ঠপোষিত সকল রাজনৈতিক, সামাজিক বা বৈশ্বিক সংগঠন সহ মজুরদের সৃষ্ট মজুরদের স্বার্থের কমিউনিস্ট পার্টি হতেও মুক্ত একটি বৈজ্ঞানিক -মানবিক সমাজ - কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করা বৈ বিকল্প নাই। এমন বিষয়টিও বিশ্ব উষ্ণায়ন সমস্যা সমাধানে পুনঃপুন ব্যর্থতার দায়ে দায়ী শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থের রাজনৈতিক গোলাম-দুনিয়ার শাসকদের ক্লাব যেমন বুঝতে অক্ষম-অযোগ্য তেমন অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর পুঁজিপতি শ্রেণী নিশ্চিত করেছে যে বিশ্ব উষ্ণায়ন সমস্যা সমাধানেও পুঁজিপতি শ্রেণী ব্যর্থ ও অযোগ্য ।

অতঃপর, জ্বালানী সংকট, তেজীভাব সহ আন্তর্জাতিক বাজারে ডলার সংকট এবং মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা, বেকারত্বের সমস্যা, বিশ্বমারী ও মহামারী সহ স্বাস্থ্য সমস্যা ও সংকট , মন্দার সংকট ও সমস্যা, পানি সংকট,জলাবদ্ধতা, যান জট, দুর্ঘটনা, খরা, বন্যা সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথাযথভাবে মোকাবেলা করা সহ পানি দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ সহ পুঁজিতন্ত্রের সৃষ্ট আরো নানান দূষণ হতে মুক্ত হতেও রাষ্ট্র সহ পুঁজিতান্ত্রিক তাবৎ সংস্থা ও সংগঠন সমেত পুঁজিতন্ত্রের বিলুপ্তি বৈ ভিন্ন কোনো বিকল্প নাই। তাই, এসকল সমস্যা হতে পরিত্রাণ ও মুক্তি পেতে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।

পূর্বেই বিবৃত হয়েছে যে , আধুনিক শিল্পের কারণেই গণতন্ত্র, সাম্য, মৈত্রী, মানবাধিকার, নারীবাদ, নৈরাজ্যবাদ ইত্যাকার নানান মতবাদ জন্ম নিয়েছে। ইতোমধ্যে, দুনিয়াময় পুঁজি-পণ্যের অবাধ গমনাগমন নিশ্চিতকরণে উপনিবেশিকতার নীতি বাতিল করে পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বায়নের রাজনীতি চালু করে একটি কেন্দ্র হতে দুনিয়ার অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে আই এম এফ সহ যে সব বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে খোদ রাষ্ট্রকে ডিফাংক্ট করে কার্যত জাতীয় রাষ্ট্রকে মৃত ঘোষণা করে রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের পলিসিও নির্ধারণ করার স্বাধীন ক্ষমতা ক্ষুন্ন ও বিঘ্ন কার্যত হরণ করেছে তাতে কোনো রাষ্ট্রই নিজে নিজের আর্থিক নীতি ও পরিকল্পনা তৈরী করতে পারছে না বিধায় গণতন্ত্রের দাবীদার রাষ্ট্রগুলোর শাসকেরা নির্বাচনে যতই তথাকথিত জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ ও জাতীয় উন্নতির নানান পরিকল্পনার কর্মসূচি ঘোষণা করুক না কেন কিন্তু নির্বাচিত হয়ে সেসব প্রতিশ্রুত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার স্বাধীনতা ও সক্ষমতা নির্বাচিত সরকারের কার্যত নাই । কারণ, কথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোইতো আই এম এফ সহ নানান বিশ্ব সংস্থার সদস্য বিধায় নির্বাচনে প্রতিফলিত গণমতামত নয় বরং কার্যকর ও রূপায়ন করতে হয় বটে আই এম এফের পলিসি বা প্রেসক্রিপশন। তাই, উল্লেখিত বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণে জাতীয় রাষ্ট্র যেমন মৃত তেমন গণতন্ত্রও মৃত। আর, অসমতা, বিভাজন, বৈষম্য, বৈরীতার পুঁজিতন্ত্রে সাম্য, মৈত্রী, মানবিকতা? সেতো সোনার পাথর বাটি বৈ কিছুই নয়। আসলে, পুঁজিপতিরাওতো শোষক তাইতো, মিথ্যাচার, প্রতারণা, বজ্জাতি, ফেরেববাজি ইত্যাকার কদাকার গুণাবলী হতে পুঁজিতন্ত্রীরাও মুক্ত নয় বলেই সম্ভব নয় জেনে-বুঝেও মৃত গণতন্ত্রের পুনরোদ্ধার বা গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতিশ্রুতি দেয় বটে লেনিনবাদীরা সহ পুঁজিতন্ত্রী রাজনীতিকেরা।

উল্লেখ্য, কথিত দৈব ক্ষমতায় ক্ষমতাবান সামন্ততন্ত্রের শাসকদের পরাজিত করে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের লড়াইয়ে সামন্ত শাসনে শোষিত–বঞ্চিত ও নিপীড়িতদের এক কাতারে শামিল করতে দৈব ক্ষমতার পরলৌকিক রাজনীতিতে স্বীকৃত অভিজাত ও অনভিজাত শ্রেণীর বিলুপ্তির প্রয়োজনে পরলৌকিকতার রাজনীতির বিপরীতে গণতন্ত্রের রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় সাম্য, মৈত্রী , মানবিকতা ইত্যাদি শ্লোগান সহ গণতান্ত্রিক রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংগ– ইহলৌকিকতার নীতি তথা স্যাকুলারিজমের নীতি ঘোষণা করেছিল বিপ্লবী পুঁজিপতিরা। শোষিতরা তা বিশ্বাসও করেছিল। কিন্তু, ১৭৮৯ সালে ফ্রান্স বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হয়ে বুর্জোয়া বিপ্লবী সরকার প্রথম সুযোগেই মজুরদের সভা–সমাবেশ নিষিদ্ধ করে পুঁজিতন্ত্রের তথাকথিত সাম্য, মৈত্রী ও মানবিকতার ভুয়া প্রতিশ্রুতির ভূয়ামি নিশ্চিত করে মজুর শ্রেণীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

কিন্তু, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, মুক্তি, মানবিকতা , ইহলৌকিকতা ইত্যকার বক্তব্য ও বোধতো ঐতিহাসিকভাবে সমাজে বিদ্যমান রইল। আবার, এককভাবে বা একাকী নয় বরং পণ্য উৎপাদিত হয় মজুরদের সম্মিলিত শ্রমে। তাই, সামাজিক শ্রমে পণ্য উৎপাদনে মজুরেরা প্রত্যেকে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও একে অপরের সহযোগী। অতঃপর, পণ্য উৎপন্নে মজুরেরা ইন্টার–ডিপেন্ডেন্ট বলে পণ্য উৎপাদনে মজুরেরা সমতার বোধে কাজ করে পণ্যটি উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক শ্রমিক তার কাজটি বিষয়ে যথার্থ বা বৈজ্ঞানিক ধারণা বা বোধ জানা ও মেনে চলা বৈ কোনো মতবাদিক বা মতাদর্শিক বা দার্শনিক বা রাজনৈতিকবোধ চর্চা করার সুযোগহীন বলে পুঁজিতন্ত্রে মজুরেরা হচ্ছে বিজ্ঞান ও সমতা বোধের বাহক। পণ্য বেচা–কেনায় পণ্যের দাম বিষয়ে ক্রেতা–বিক্রেতা সহমত তথা সমতায় উপনীত হয়

। তাই, কেনা-বেচা ভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রে কেনা-বেচায়ও সমতার নীতি কার্যকর করে সমতার বোধের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সমাজের সামনে হাজির করে সমাজে সমতার বোধের প্রসার ঘটাচ্ছে। পরিবহনেও যাত্রীরা নিজ নিজ আসনে ব্রাহ্মণ -চাঁড়াল বা দলিত পাশাপাশি বসে ভ্রমণের সুযোগ পাওয়ার কারণে দাসযুগের শাসকদের সৃষ্ট জাত-পাতের অমানবিক বোধ চরমভাবে আঘাতপ্রাপ্তই হচ্ছে না বরং বিপন্ন হচ্ছে বটে সমতার পরিপন্থী বা সমতার নীতির সাথে সাংঘর্ষিক সাবেকী অসমতার বোধ মূলত আধুনিক যোগাযোগ ও পরিবহন সমৃদ্ধ পুঁজিতন্ত্রের হেতুবাদে। পুঁজিতন্ত্রী সমাজ সচল রাখতে মনুষ্য যন্ত্র উৎপন্নে পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা শিল্প তথা আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও নানান সম্প্রদায়ের বা ধনী-গরীব পরিবারের সন্তানরা একই শ্রেণীতে একই বেঞ্চে পাশা-পাশি বসে ক্লাস করে এবং স্কুলের খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশী হয়ে বন্ধুত্বের বোধে সমৃদ্ধ হয় বলেই তারাও সাবেকী বোধ তথা সাম্প্রদায়িক বোধের গন্ডি যেমন অতিক্রম করছে তেমন সমতা , মৈত্রী বা বন্ধুত্বের বোধ উন্নীত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে বটে পুঁজিতন্ত্রে। পেশাধারীরাও পারস্পারিক সহযোগীতা ও সমতার বোধে কাজ করা বৈ তাদের পেশাগত কাজ সম্পাদন করতে পারে না বিধায় পেশাজীবীরাও তাদের পেশার শর্তে সাবেকী বোধকে পরিত্যাগ করতে হচ্ছে। তাইতো, দাস যুগের সৃষ্ট কোনো গুরুজীর অসার ও ভুয়া গুরুবাণী বা পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের কোনো পরজীবী নেতাজীর নেতৃত্বে নয় বরং বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিকতা ও সমতা বোধের সূচনা , বিকাশ ও প্রসার সাধন করছে বটে পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ের পুঁজিতন্ত্রী সমাজ নিজেই ।

অতঃপর, মুক্তি ও সাম্য বোধের বিকাশে পণ্য উৎপাদন ও বিনিময় যেমন সরাসরি ভূমিকা রাখছে তেমন পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণ–শাসন হতে মুক্তির আকাংখাও মজুর শ্রেণীর মধ্যে জাগাটা স্বাভাবিক। তবে, কমিউনিজমের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে মজুরদের একটি পার্টি হলে বা থাকলে সেই পার্টিটি দুনিয়ার মজুরদের একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য একতাবদ্ধ করতে আবশ্যকীয় বোধ তথা বিজ্ঞান ও সমতার বোধের প্রচার ও প্রসারে যেমন গতি পাবে তেমন পুঁজিতন্ত্রীদের সৃষ্ট তথ্য–প্রযুক্তিও এসব বোধের প্রচার ও প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এক নেটইতো তথ্য প্রাপ্তির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করে দাসযুগের সৃষ্ট কথিত গুরুদের গুরুগীরির অপ্রয়োজনীয়তা যেমন নিশ্চিত করছে তেমন তথাকথিত মেধাবী তাই এক্সট্রা অর্ডিনারী ও অভিজাত তথা আপার ক্লাসের কথিত বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি বেচা–কেনার ব্যবসা– বাণিজ্য বা রাজনৈতিক নেতাদের নেতাগীরির বাজার ক্রমেই সংকোচিত হচ্ছে । অতঃপর, স্বাধীনতা, মুক্তি , সাম্যের সমাজ– কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার সকল শর্ত, আয়োজন ও আঞ্জামতো করছে বটে পুঁজিতন্ত্রের অন্যায় সুবিধাভোগী তবে পুঁজিতন্ত্রকে সচল রাখতে অক্ষম ও অযোগ্য শ্রেণী –পুঁজিপতি শ্রেণী নিজের অজ্ঞাতেই তবে মহাক্ষমতাধর পুঁজির চাপে বাধ্য হয়ে।

নারীবাদীরা পুঁজিতন্ত্রের বিরোধী না হলেও তারা যে দাবী করছে শরীরের স্বাধীনতার তাওতো পুঁজিতন্ত্রে সম্ভব নয় পুঁজির সীমাবদ্ধতার কারণেই। আবার এলজিবিটির পক্ষেতো এখন খোদ জাতিসংঘ সহ বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র। সেইম সেক্স ম্যারেজও স্বীকৃত হয়েছে কয়েকটি রাষ্ট্রে। পরিবার ও সেক্স বিষয়ে প্রথাগত ধারণার বিপরীত হয়েও সেইম সেক্সের লোকেরা বিয়ের মাধ্যমে পরিবার গড়ছে যা হচ্ছে পুঁজিতান্ত্রিক স্ববিরোধীতা। তবে,সম্প্রতি নানান পরিসংখ্যানে

প্রকাশিত যে, ২০২১ সালে ফ্রান্সে সিংগেল মাদার বেবী তথা বিবাহ বহির্ভূতভাবে সন্তান জন্মানোর হার ছিল মোট বেবীর ৬০% তার পরেই জার্মানী আর আমেরিকাতো কয়েক বছর আগে এ বিষয়ে ইউরোপের চেয়ে এগিয়ে ছিল। কিন্তু, দুনিয়া ব্যাপী এখনো সাধারণভাবে শরীরের স্বাধীনতা বা পার্টনারদের স্বেচ্ছা সম্মতিতে সেক্স স্বীকৃত নয় বা সার্বজনীনভাবে তা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি । কিন্তু, এদাবী জোরদার হওয়া বৈ কমছে না। আবার বিবাহের হার যেমন কমছে এমনকি আর্জেটিনা-ব্রাজিলেও তেমন বিবাহ বিচ্ছেদের হার বাড়ছে বটে কম বিবাহের দেশ জাপানেও । ধনিক শ্রেণীর প্রথম কাতারের প্রথম দিককার ব্যক্তিগণও বিবাহ বিচ্ছেদের তালিকাভুক্ত। তাতে, সাবেকী যৌথ পরিবারতো এখন স্বাভাবিক নিয়মেই প্রায় বিলুপ্ত ও বিলীনে ভাংগছে এবং ভাংগাটাই স্বাভাবিক পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের কারণেই আর স্বামী- স্ত্রীর বিবাহে বিচ্ছেদের মাধ্যমে ভাংগছে বটে এক পতি-পত্নীর পরিবারও।

কিন্তু, ভেংগে চুরে বিধ্বস্ত ও বিপন্ন হলেও পরিবার প্রথা এখনো আছে এবং আছে বটে পারিবারিক ও রাষ্ট্রিক বোধ । কারণ, ক্রমাগত ক্ষয়মান ও ম্রিয়মান ব্যক্তিগত সম্পত্তি এখনো বিদ্যমান আর ব্যক্তিগত সম্পত্তিই হচ্ছে পরিবার, রাষ্ট্র ইত্যাদি উৎপত্তি ও সৃষ্টির কারণ। অতঃপর, ব্যক্তিগত সম্পত্তিমূলী পুঁজিতন্ত্রকে রক্ষা ও সংরক্ষায় পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তির সমবায়িক মালিকানা, বহুজাতিক মালিকানা, রাষ্ট্রিক মালিকানা ইত্যকার নানান ধরণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে ক্রমাগত ক্ষয়মান বা ক্ষয়িষ্ণু সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাকে বিলীন ও বিলুপ্তির শর্ততো তৈরী করছে খোদ পুঁজিতন্ত্র। তাই, রাষ্ট্র ও পরিবার বিলুপ্তির শর্তাদিও তৈরী করছে বটে পুঁজিতন্ত্র। আবার, শরীরের স্বাধীন বা স্বেচ্ছাধীন ব্যবহারের দাবীও উত্থাপনের অবস্থা ,

শর্ত ও সুযোগ তৈরী করেছে বটে পুঁজিতন্ত্রই আর এসব দাবী জোরদার হতে সহায়ক বটে পুঁজিতন্ত্রী তথ্য-প্রযুক্তিও।

অতঃপর, অন্তোসব স্ববিরোধীতার পুঁজিতন্ত্র অচল ও অকার্যকর হচ্ছে পুঁজির অস্তিত্বের কারণে ফলে, পুঁজিতান্ত্রিক স্ববিরোধীতায় সৃষ্ট পুঁজিতন্ত্রের অচলতা ও অকার্যকরতার ফল তথা স্ববিরোধীতার পুঁজিতন্ত্রের পরিণতিতে বিলুপ্ত হবে ব্যক্তিগত মালিকানা তথা পুঁজিতন্ত্রী মালিকানা। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় মালিকানা সহ পুঁজিতন্ত্রকে রক্ষায় পুঁজিপতি শ্রেণী যে সকল মালিকানার প্রবর্তন ও বহাল করেছে সেসব ধরণের মালিকানা কিন্তু পুঁজিকে তথা পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতিকে রক্ষা করতে প্রবর্তন করেছে। তাই, পুঁজিতন্ত্রে যত ধরণের মালিকানা আছে সবই হচ্ছে পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানা আর পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানাধীন সম্পত্তি মানে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তি। অতঃপর, ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকলে তথা সম্পত্তির পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানা না থাকলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি তথা পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানাধীন সম্পত্তি রক্ষণা-বেক্ষণ ও সংরক্ষায় কোনো উত্তরাধিকার থাকার অবকাশ নাই । অতঃপর, বৈধ উত্তরাধিকার জন্মানোর জন্য যেসব আইন-কানুন , বিধি- বিধান ও প্রথা এখনো বিদ্যমান সেসব থাকার প্রশ্নও অবান্তর নয় কি? ফলে, পুঁজিতন্ত্রের শেষ গন্তব্য -পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তির বিলুপ্তিতে সামাজিক মালিকানার তাই, রাষ্ট্রহীন- পরিবারহীন কমিউনিজমে ব্যক্তিই হচ্ছে সমাজের বেসিক ইউনিট। তাইতো, স্বাধীনতা ও মুক্তির সমাজ- কমিউনিজমে প্রত্যেকে স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ।

ঋণ ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর ব্যক্তি পুঁজিপতির বিনিয়োগ সক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমন শেয়ার মার্কেট চালু হওয়ায় ব্যক্তি

মালিকানার মধ্যেই সামাজিক মালিকানার ভিত তৈরী ও প্রশস্ত হয়ে খোদ পুঁজিপতি শ্রেণীর অপ্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্র পরিপূর্ণ বিকশিত হয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে ব্যক্তিমালিকানার সীমাবদ্ধতা ও বিকাশে অক্ষমতা দৃশ্যমান করেছে। ফলে, ব্যক্তিমালিকানা বিলুপ্ত হয়ে সামাজিক মালিকানার অনিবার্য্যতা ও অপরিহারযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে। অর্থাৎ, পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতির বিলুপ্তির সাথে সাথে পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীও বিলীন হবে এমনটাই বাস্তব সত্য হিসাবে দেখা দিয়েছে। পুঁজিতন্ত্রের এরূপ সংগীন অবস্থায় পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণী নিজের অস্তিত্বহীনতার বিষয়টি টের পেয়ে স্বীয় বিলুপ্তি হতে রেহাই পেতে পুঁজিতন্ত্র বিলুপ্তিকারী তথা পুঁজিপতি শ্রেণীর কবর খোদক মজুরদেরকে বৈজ্ঞানিক বোধ হতে দূরে রাখতে ও বিভ্রান্ত করতে সহায়ক ও কার্যকর একদা প্রগতিশীল বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক পরিত্যাক্ত ও পরিত্যাজ্য দাস ও সামন্ত সমাজের শাসকদের ক্ষমতার উৎস – দৈব শক্তির তথা পরলৌকিকতার রাজনীতির নিকট আশ্রয় নিয়ে সামন্ত সমাজের শাসকদের মতো পুঁজিপতিরাও দৈব শক্তির কৃপায় ও দৈব ক্ষমতায় পুঁজিপতি বৈ মজুরদের শ্রম শোষণ করে পুঁজিপতি নয় এবং পুঁজিও নয় বটে অপরিশোধিত শ্রম তথা শ্রম শোষণের ফল তাই, মজুরেরাও যাতে নিজেদের দুর্ভোগ– দুর্দশার জন্য পুঁজিপতি শ্রেণী বা পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তিকে দায়–দোষী না করে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ বিলোপনে কোনো কাজ না করে বরং নিজেদের দুর্ভোগ ও দুদর্শা হতে মুক্তি লাভে দৈব শক্তির কৃপা লাভে রত ও ব্যাপ্ত হয়ে নিজের যাবতীয় দুর্ভোগের জন্য দৈব শক্তির রোষে নিপতিত হওয়া বা থাকার বা দৈব শক্তির কৃপা লাভ না করার জন্য নিজেদেরকেই দায়–দোষী গণ্য করে সেজন্য বুর্জোয়া শ্রেণীর পত্তনকৃত ইহলৌকিকতার রাজনৈতিক পদ্ধতি– গণতান্ত্রিক রাজনীতির

অবিচ্ছেদ্য অংগ – স্যাকুলারিজমের নীতির সাথে বৈরী ও সাংঘর্ষিক দাস ও সামন্ততান্ত্রিক রাজনীতিকে পুষ্ঠ ও পুনঃপ্রবর্তনে সচেষ্ট হয়ে ক্রমাগত ফান্ডাম্যান্টালিজম, ফ্যানাটিকিজম , এবস্যুলেট ডিক্টেরিজম বা হালের সংস্কারকৃত রূপ ফ্যাসিজম ইত্যকার চরম হিংস্রতার রাজনীতি চর্চা করে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ কালের বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণী নিজেই একটি প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে মার্কস- এ্যাংগেলস কর্তৃক কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার রচনার পূর্বেই যার বিবরণ কমিউনিস্ট ইস্তেহারের শুরুর দিকে বিবৃত হয়েছে।

কোনো সন্দেহ নাই, শোষক বলেই প্রতিক্রিয়াশীল শোষক পুঁজিপতি শ্রেণী নিজেই নিজের উত্থান ও বিকাশের ইতিহাস তথা নিজের জন্ম ও বিকাশের ইতিহাসকে অস্বীকার করতে গিয়ে ভুলে গেছে যে সামন্ত সমাজের শাসকেরাও চিরকালীন টিকে থাকার জন্য নানান নিপীড়নমূলক আইন –কানুন করে সামন্তবাদ বিরোধীদেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে হত্যা করা সহ নানান রকমের পীড়ন করে দমন করতে কসূর করেনি। কিন্তু, প্রকৃত সত্য হচ্ছে সামন্ত সমাজের মধ্যেই সৃষ্ট পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতির নানান যন্ত্রপাতির উপযুক্ত ও যথাযথ ব্যবহার যেমন সামন্ততন্ত্রে সম্ভব ছিল না অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রে সেসব নতুন নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহার ছিল অসম্ভব তেমন সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কের সাথে সাংঘর্ষিক ও বৈরী ছিল বটে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতির নতুন নতুন যন্ত্রপাতি।

অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতির যন্ত্রপাতির উপযুক্ত ও যথাযথ ব্যবহারের উপযোগী পুঁজিতন্ত্রী সমাজ ছিল বটে সামন্ত সমাজেরই অনিবার্য ফল অর্থাৎ সামন্ত সমাজে সৃষ্ট কিন্তু সামন্ত সমাজে উপযুক্ত ব্যবহার হতে না পারা পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের হাতিয়ারাদির উপযুক্ত

ব্যবহারের যে শর্ত সামন্ত সমাজে তৈরী হয়েছিল সেই শর্তপূরণ করার শর্তেই পুঁজিপতি শ্রেণী সামন্ত সমাজকে বাতিল ও বিলীন করে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে দুনিয়াটাকে পণ্যের বাজার বানিয়ে । এক্ষেত্রে, ঘুষ, বকশিশ, প্রতারণা , বিশ্বাসঘাতকতা, খুন, যুদ্ধ সহ হেন কোনো কর্ম বা দুস্কর্ম নাই যা বিপ্লবী পুঁজিপতিরা করে নাই। দাস ও সামন্ত সমাজ যেমন কারো উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তা বা পরিকল্পনার ফসল নয় তেমন পুঁজিতন্ত্রও নয় । বরং সামন্ত সমাজের ঐতিহাসিক পরিণতি ছিল আধুনিক পুঁজিতন্ত্র। আবার, কোনো শাসক বা শাসক বর্গ পতনোন্মুখ কোনো সমাজকে পতনের কবল হতে রক্ষা করতেও পারেনি যদিচ, পুরনো, মরণাপন্ন ও বিপন্ন সমাজকে রক্ষা করতে শাসক শ্রেণী ও শাসকবর্গ চেষ্টা ও অপচেষ্টা এবং খুন-খারাবি সহ যাবতীয় দুস্কর্ম ও অপকর্ম কম করেনি।

তাইতো , টিকে থাকতে বহু চেষ্টা, অপচেষ্টা ও দুস্কর্ম করেও সামন্ত সমাজের শাসকেরা সমাজ পরিবর্তনের নিয়মেই ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিপতিত হয়েছে আর বুর্জোয়া শ্রেণী দুনিয়াময় বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশ ও প্রসার ঘটিয়ে বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রী সমাজের শাসক শ্রেণী হিসাবে অধিষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতঃপর, যে নিয়মে সামন্ত সমাজ বিলীন হয়ে বুর্জোয়া সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজ পরিবর্তনের সেই নিয়মেই বুর্জোয়া সমাজ বিলুপ্ত হবে। সামন্ত সমাজের বিলুপ্তি সাধন করেছে সামন্ত সমাজের অন্যায় ও অন্যায্য সুবিধাভোগী তথা সামন্ত সমাজের শোষক-শাসক শ্রেণী -সামন্ত লর্ডদের সাথে পণ্য উৎপাদন জনিত কারণে বিরোধে জড়িত বুর্জোয়া শ্রেণী আর ,বুর্জোয়া সামাজের বিলুপ্তি সাধন করে সামাজিক মালিকানার কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করবে বটে বুর্জোয়া সমাজের অন্যায্য

ও অন্যায় সুবিধাভোগী তথা বুর্জোয়া সমাজের শোষক–শাসক শ্রেণী – বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে পুঁজির জন্মসূত্রে বিরোধে লিপ্ত মজুর শ্রেণী।

তাই, বুর্জোয়া সমাজের সৃষ্ট পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন ও বিনিময়ের নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ারাদির যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যবহারে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তি ভিত্তিক তথা পুঁজিতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক যোগ্য নয়, উপযুক্ত নয় এবং সক্ষম নয় বিধায় এসকল নতুন নতুন ও উন্নত হতে উন্নতর হাতিয়ারাদির যোগ্য, উপযুক্ত ও যথাযথ ব্যবহারোপযোগী সামাজিক সম্পর্কের একটি সমাজের শর্ত তৈরী করছে বটে খোদ পুঁজিতন্ত্র। আর , এই শর্ত পূরণের শর্তে সামাজিক মালিকানার সমাজ– কমিউনিজম হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রী সমাজের অভ্যন্তরে সৃষ্ট পুঁজিতন্ত্র বিনাশী ও বিরোধী বস্তুগত ভিত্তি, শর্ত ও নীতির সফল বাস্তবায়ন ও যথার্থ রূপায়ন মাত্র।অতঃপর, কমিউনিজম হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিণতি। সুতরাং,সমাজের ইতিহাস মতো তথা সমাজ পরিবর্তনের নিয়মেই বুর্জোয়া সমাজের পতন আর কমিউনিজমের উত্থান হচ্ছে সমান অনিবার্য।

কিন্তু, প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী ইতিহাসের সুফল ভোগী হয়েও কেবলই টিকে থাকতে ইতিহাসের সত্যকে অস্বীকার বা সমাজ পরিবর্তনের নিয়মকে অবজ্ঞা করে কেবলই টিকে থাকতে নির্লজ্জদের শেষ কাতারে নেমে দাস ও সামন্তবাদের রাজনীতি যা বুর্জোয়া কাঠামোতে অনোপযোগী ও বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতির বিরোধী সেই প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির নিকট আশ্রয় নিয়ে ইতিহাসের গর্তে ঠাঁই নিয়েও টিকে থাকার অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত বিধায় বুর্জোয়া অর্থনীতির মূল ভিত্তি– ব্যক্তি মালিকানার সাথে অসমাঞ্জস্যপূর্ণ ও সাংঘর্ষিক নানান বিধি–ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ নেয় ও নিচ্ছে ।

ব্যক্তি খাতের ব্যর্থতা বা অক্ষমতায় কিন্তু পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন যার লক্ষ্য হচ্ছে মজুরের শ্রম শোষণ করে পুঁজি গঠন তা জারী ও অব্যাহত রাখতে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির পত্তন করেছিল বটে পুঁজিপতিরাই। উল্লেখ্য, দাস ও সামন্ত সমাজে রাজা–বাদশারাই ছিল কার্যত সকল সম্পত্তির মালিক তবু পতিত সেই দুই সমাজের শাসক শ্রেণীর সদস্যরা সেই সব সম্পত্তি ভোগ–দখল ও ব্যবহারের অধিকারী ছিল বটে। তবে, দান–অনুদান বা খয়রাতের রাজনীতির সূচনা করে রাজকোষের খরচে এবং রাজা– বাদশাদের সরাসরি মালিকানায় এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে জলাধার, জলপথ , রাজপথ, সরাইখানা , ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যকার কিছু সম্পত্তি ছিল কথিত জনকল্যাণে বা ক্ষেত্র বিশেষ সাধারণের সাধারণ ব্যবহারের নিমিত্তে। কোনো কোনো সামন্তপতিও এধরণের কাজ করে প্রজাদের তাবৎ দুর্দশা ও দুর্ভোগের কারক বর্বর রাজাদের মতোই প্রজাহিতৈষী সাজার চেষ্টা করতেন। সেই, তারা নিজেদেরকে দানবীর ও সমাজের উদ্ধারকর্তা বা পরম পরিত্রাতা হিসাবে নিজেদেরকে জাহির করে কার্যত পতনোম্মুখ সমাজটাকে পতনের কবল হতে রক্ষা করার অপচেষ্টা করতেন বটে। কিন্তু, ব্যর্থ।

পুঁজিতন্ত্রে পুঁজিপতিরাও শোষক ও শাসক শ্রেণী বলেই অতীতের শোষক– শাসকদের শোষণ ও শাসন ক্ষমতায় বহাল থাকার নীতিগুচ্ছের একটি অর্থাৎ কথিত প্রজাক্লেশ নিবারণে অনুসৃত তথাকথিত জনকল্যাণ বা দান–দক্ষিণা বা অনুদান ইত্যাদি প্রদানের নীতি অনুসরণ করাটাই স্বাভাবিক। যদিচ, শিল্প উৎপাদন বাড়াতে শিল্পের মজুরের যোগান ঠিক রাখতে বা বাড়াতে ইংল্যান্ডে ভবঘুরে বিরোধী আইনে বহু ভিক্ষুক, যুদ্ধে পরাজিত বা পলাতক বা সমাজের

অতি নিম্ন বর্গের তবে কর্মে অনিচ্ছুক বহুজনকে মুত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু, পুঁজিতন্ত্রে পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তি বিপন্ন বা সংকটাপন্ন হলে প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় তহবিল হতে ভর্তুকি দিয়ে সেসব শিল্পকে রক্ষার নীতিও বুর্জোয়ারাই গ্রহণ করে সেই সব শিল্পের মালিকদেরকে দান-অনুদান বা ভিক্ষা দেওয়ার রীতি অনুসরণ করছে বটে বুর্জোয়ারাই। কিন্তু, তাতেও যদি রুগ্ন ও সংকটাপন্ন শিল্প সচল না থাকতে পারে বা যুদ্ধ সহ যে কোনো কারণে পরিত্যাক্ত ও বন্ধ হওয়া শিল্পকে চালু ও সচল রাখতে তথাকথিত জাতীয় স্বার্থের অজুহাতে সেসব পরিত্যাক্ত, বন্ধ বা বিপন্ন বা সংকটাপন্ন পুঁজিতান্ত্রিক শিল্প ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা এবং জাতীয়করণকৃত সম্পত্তি সরাসরি রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার রাষ্ট্রিক নীতি প্রবর্তন করেছে বটে বুর্জোয়ারাই যাদের অস্তিত্বের ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

আবার, আধুনিক শিল্পের প্রয়োজনে ও পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে বিদ্যুৎ, রেল ,বিমান বা সড়ক পথ বা বড় বড় ব্রীজ ইত্যকার বিশাল পুঁজির অত্তো বিশালাকৃতির সম্পত্তির পত্তন ও পরিচালন বা নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তি পুঁজিপতিদের অক্ষমতা, অযোগ্যতা বা ব্যর্থতায় যুদ্ধসহ কোনো কারণে কোনো পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তি পরিত্যাক্ত হলে তার দায় ভার রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রহণ করার জন্য জাতীয়করণ নীতি কার্যকরণে পুঁজিতন্ত্রের শাসকেরাই তথাকথিত জাতীয় স্বার্থ বা জনহীতের রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে কসূর করে না আবার নামমাত্র মূল্যে এসব শিল্প ব্যক্তিমালিকানায় ফেরৎ দিতেও একইভাবে কথিত জাতীয় স্বার্থে প্রণীত বিরাষ্ট্রীয়করণের নীতির মাহাত্ব ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে কথিত জাতীয় স্বার্থের বন্দনা গাইতেও লজ্জিত হয় না বটে দ্বিমুখী

নীতির দ্বিচারী বুর্জোয়া শাসকেরা। তবে, জাতীয়করণকৃত খাতের মজুরেরা যেমন শোষিত হয় বেশী হারে তেমন রাষ্ট্র স্বয়ং জাতীয়করণকৃত খাতের মালিক হিসাবে এখাতের মজুরদের যে কোনো ক্ষোভ-বিক্ষোভ খোদ রাষ্ট্র নিজেই সরাসরি দমন -পীড়ন করার চেষ্টা করে।

আবার , প্রথাগত পুঁজিতন্ত্রে বা ব্যক্তিখাতের মজুরেরা তাদের মজুরী সহ সুযোগ-সবিধাদি নিয়ে মূলা-মূলি করার অধিকারী হলেও জাতীয়করণকৃত খাতের মজুরদের বার্গেনিং রাইট নাই। চাহিদা ও সরবরাহের বাড়তি ও কমতিতে পণ্যের দামও কমতি ও উঠতির নিয়ম সহ প্রথাগত পুঁজিতন্ত্রের বাজারের নিয়ম তথা ক্রেতা-বিক্রেতার দরাদরিতে পণ্য মূল্য নির্ধারণের নিয়ম, সুযোগ ও অধিকার হতে জাতীয়করণকৃত খাতের মজুরদের বঞ্চিত করে রাষ্ট্রের নির্বাহী বা প্রধান নির্বাহীর একতরফিয়া সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রীয় খাতের মজুরদের মজুরি সহ অপরাপর সুবিধাদি নির্ধারণ করা হয়। ফলে, জাতীয়করণকৃত খাতে শোষণ, দমন-পীড়নের হার ব্যক্তিখাতের চেয়ে বেশী। তাতে, মোট পুঁজির পরিমাণ বাড়া বৈ কমে না। ফলে, বিপন্ন পুঁজিতন্ত্রের জন্য জাতীয়করণ আপাতদৃশ্যে সুবিধাজনক। কিন্তু, তা যে পুঁজিতন্ত্রের মূল ভিত্তি- ব্যক্তিমালিকানার অক্ষমতা ও অপ্রয়োজনীয়তার শর্তটা সামনে হাজির করে সামাজিক মালিকানার প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে এসে সামাজিক মালিকানার একটি নতুন সমাজের শর্ত হাজির করে সেই শর্ত পূরণের শর্তটাও সমাজের সামনে হাজির করছে তা কিন্তু, একচোখা পুঁজিপতি শ্রেণী যথাযথভাবে হিসাবে নিতে পারছে না কেবলই পুঁজিকে টিকিয়ে রেখে নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখার ইতিহাস বিরোধী তাই প্রতিক্রিয়াশীল বোধে আচ্ছন্ন হয়েছে বলে।

পূর্ণ বিকশিত তাই বৃদ্ধ পুঁজিতন্ত্রকে বিলীন করে সামাজিক মালিকানার কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার অনিবার্যতায় কমিউনিজমের বিজ্ঞান যখন মার্কস কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং এ্যাংগেলস কর্তৃকও ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং পুঁজিতন্ত্র বিলীনে দুনিয়ার মজুরদেরকে একতাবদ্ধকরণে মজুরদের সংগঠন যথা কমিউনিস্ট লীগ ও প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন অনুরূপ কারণ ও লক্ষ্যে না হলেও ১৮৭১ সালে প্যারী কমিউন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রমিকদের দ্বারা। কিন্তু, বুর্জোয়াদের দমন-পীড়নে উল্লেখিত ৩ টি সংগঠনই বিলুপ্ত ও বিলীন হওয়ার মাধ্যমে দুনিয়ার মজুরেরা স্বীয় মুক্তি হাসিলের লড়াইয়ে সাময়িকভাবে পরাজিত হলেও অভিজ্ঞ হয়ে কমিউনিজমের প্রতি আরো আগ্রহী হয়েছিল। তখন ইউরোপের দেশে দেশে মজুরদেরকে প্রতারিত করতে নানান ধাঁচের স্যোসাল ডেমোক্রেটিক লেবর পার্টি গড়ে তুলেছে বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ভৃত্যরা দুনিয়ার মজুরদেরকে তাদের মুক্তি বিষয়ে বিভ্রান্ত করে রাষ্ট্রীয় গন্ডীতে পুঁজির বিকাশ ঘটিয়ে মজুরদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর জাতীয় মুক্তির রাজনীতিতে তথা দেশপ্রেমের আবেগী রাজনীতিতে মজুরদেরকে আচ্ছন্ন করে মজুরদের শ্রেণী পরিচয় মুছে দিয়ে তাদের শ্রেণী স্বার্থকে অস্বীকার করে মজুরদের শ্রেণী সংগ্রামকে আড়াল ও কবরস্ত করে এক দেশের মজুরদেরকে আরেক দেশের মজুরদের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দুনিয়ার মজুরদেরকে দেশ-জাতির পরিচয়ে ও গন্ডীতে ভাগ-বিভাগ ও বন্দী করে দুনিয়ার মজুরদের একতার পথে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্রকে তার চরম পরিণতি তথা পুঁজিতন্ত্রকে ধ্বংস করার মাধ্যমে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার কমিউনিস্ট আন্দোলন যা কেবলমাত্র একাকী মজুর শ্রেণীর আন্দোলন তা হতে পুঁজিতন্ত্রকে সংরক্ষা করতে।

উল্লেখ্য, দুনিয়ার মজুরদের ঐক্য হচ্ছে মজুরদের মুক্তির প্রথম শর্ত আর কমপক্ষে নেতৃস্থানীয় উন্নত দেশগুলোর সম্মিলিত ক্রিয়া হচ্ছে মজুরদের মুক্তির প্রথম শর্তগুলোর একটি মর্মে সূত্রায়নতো যথার্থভাবে বিবৃত হয়েছে মার্কস ও এ্যাংগেলস কর্তৃক রচিত এবং ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহারে। আর, কমিউনিস্ট লীগের বিলুপ্তির পর পুঁজিতন্ত্রকে বিলুপ্ত করে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মজুরদের মুক্তির জন্য একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার মজুরদেরকে একতাবদ্ধ করতে গড়ে উঠেছে প্রথম আন্তর্জাতিক। প্যারি কমিউনের পতনের পর প্রথম আন্তর্জাতিক বিলীন হলে একই লক্ষ্য বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়ে গঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক। কিন্তু, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রধান প্রধান নেতারা যারা আবার জার্মান স্যোসাল ডেমোক্রেটিক লেবার পাটিরও নেতা এবং প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে জার্মানী পরাজিত হলে যুদ্ধ বিধ্বস্ত জার্মানীর তবে বাজার সংকটে ভোগা বলা চলে গভীর সংকটে পড়া পুঁজিপতিদের সেবা ও রক্ষা করতে এই নেতারা জার্মানীতে সরকারে দায়িত্ব নিয়েছিল এবং একই দলের একদা নেত্রী রোজা লুক্সেমবার্গকে খুন ও গুম করেছিল সেই হিংস্র ব্যক্তিরাই তাদের কর্তৃত্বে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ১৮৯৬ সালের লন্ডনে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে শ্রমিকদের মুক্তির নামে দুনিয়ার নিপীড়িত জাতি সমূহের কার্যত কলোনীভুক্ত জাতিসমূহের তথাকথিত আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার তথা জাতীয় মুক্তির রাজনীতি গ্রহণ করার মাধ্যমে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বিভ্রান্তির চোরাগলিতে ছুড়ে ফেলে দুনিয়া হতে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ধুয়ে-মুছে সাফ করার বিহীত করার দুস্কর্মটি সম্পন্ন করার ভয়ানক অপচেষ্টা করেছিল।

উল্লেখ্য,১৮৭১ সালের ফ্রান্স-জার্মান যুদ্ধে জার্মানীর নিকট পরাজিত ও বন্দী ফ্রান্সের রাজা নেপোলিয়ন এবং নেপোলিয়নের সহযোগী

কার্যত প্যারিসের মজুরদের নিকট হেরে যাওয়া ফ্রান্সের বুর্জোয়াদেরকে রক্ষা করতে জার্মানির রাজা কিং –উইলিয়াম–১ প্যারি কমিউনকে ধ্বংস করতে ফ্রান্স –জার্মান যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও এবং পরাজিতের পক্ষে গুন্ডামি করে প্যারির বিদ্রোহী মজুরদেরকে দমনের পুরষ্কার তথা গুন্ডাগীরির অর্থে এবং সুবিধায় জার্মানীতে পুঁজিতন্ত্রী অবকাঠামো তৈরী ও সংস্কারের হেতুবাদে জার্মানীর পুঁজিপতিরা পুঁজিতন্ত্রী উন্নয়নে কৃতিত্ব লাভ করে ১৯০৩ এর বিশ্ব মন্দার দ্বারপ্রান্তে এসে থমকে পড়ে। আবার, জার্মানীর পণ্য বিশ্ব বাজারে চালান করার মতো তেমন সুবিধা ছিল না জার্মানীর পুঁজিতন্ত্রীদের। কারণ, বিশ্ব বাজারতো ইতোমধ্যে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স , স্পেন ইত্যাদি কলোনিয়াল দেশগুলোর পুঁজিপতি শ্রেণীর দখলাধীন কলোনীতে ভাগ–বিভক্ত ও দখলীকৃত। অতঃপর, নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তির নামে কলোনীভূক্ত জাতিগুলোকে সংশ্লিষ্ট কলোনী হতে মুক্ত করে পুঁজিতন্ত্রী কাঠামোর মধ্যেই কথিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে মজুরদের মুক্তির কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশ ও প্রসার করার ধূর্তামির রাজনীতির মাদকতায় আচ্ছন্ন করার মাধ্যমে সেসব দেশের মজুরদের সহায়তায় উপনিবেশ হতে মুক্ত হওয়া দেশগুলোতে তথা বিশ্ব বাজারে জার্মানির পুঁজিপতিরাও বেচা–কেনার সুযোগ পাবে। আর সেই সুযোগের জন্য জার্মানীর শাসকেরা দেশে দেশে যেমন জাতীয় মুক্তির রাজনীতির প্রচার ও প্রসারে বিপুল অর্থ ব্যয় করেছিল সে সব দেশের কথিত দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের সহযোগীতায় তেমন জাতীয় মুক্তির রাজনীতি বাস্তবায়নে প্রয়োজনে স্বশস্ত্র যুদ্ধের ইন্ধনও দিয়েছিল।

উল্লেখ্য, পুঁজিতন্ত্রের বিকাশে যুক্তরাজ্য সহ ইউরোপের বিভিন্ন পুঁজিতন্ত্রী দেশের বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণীকে ইউরোপের বাইরের

অজ্ঞাত দুনিয়াকে আবিষ্কার ও বিজয় করে বিশ্ব বাজার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রকে একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে নিজেদের কলোনী স্থাপনে ও কলোনিয়াল শাসন বহাল রাখতে তথা কলোনীগুলোতে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির সূচনা ও বিকাশে ইউরোপের কলোনিয়াল শক্তি তথা কলোনিয়াল দেশের পুঁজিপতি শ্রেণীকে সহযোগিতা করে ইতোমধ্যে পুঁজিপতি শ্রেণীর অংশী হয়েছে যে নেটিভরা সেই নেটিভ পুঁজিপতিদের মধ্যেও অসমপ্রতিযোগিতার বিশ্ব বাজারে টিকে থাকতে নিজ নিজ দেশের শাসক শ্রেণীর মর্যাদা ও কর্তৃত্ব লাভের মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে শক্ত-পোক্ত প্রতিযোগী হওয়ার বাস্তববোধ , চিন্তা ও চেতনা দেখা দেয়। অতঃপর, বিশ্ব বাজারে শক্ত-পোক্ত প্রতিযোগী হতে কলোনিগুলোর পুঁজিপতিদের মধ্যে যে বোধ ও চেতনা বা আকাংখা তৈরী হয়েছিল সেই বোধ ও চেতনার সহায়ক রাজনীতি হিসাবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কথিত জাতীয় মুক্তির রাজনীতি তখন কলোনীগুলোতেও বাজার পায়।

১৯০৩ সাল হতে মহামন্দায় আক্রান্ত হয়ে কলোনিয়াল দেশের পুঁজিপতিরা যেমন ভয়ানক সংকটে পতিত হয়ে নিজেরাই নানান বিরোধ-বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল তেমন কঠিন সংকটে পড়া জার্মানীর বুর্জোয়াদেরকে রক্ষা করতে জার্মানীর সম্রাট- কাইজারই প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শুরু করে । ফলে, বিপুল হত্যাযজ্ঞ সহ বেশুমার ধ্বংস লীলা সহ নানান জঘন্য তান্ডব যা হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেসবতো হয়েছে কেবলই মহামন্দায় আক্রান্ত , সংকটাপন্ন ও ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্রকে বিলুপ্তির কবল হতে রক্ষা করতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও সংঘটিত হয়েছে একই কারণে অর্থাৎ ১৯২৯ হতে শুরু হওয়া মহামন্দায় যা পুঁজিতন্ত্রের অনিবার্য তবে অনিরাময়যোগ্য একটি ব্যাধি।

উল্লেখ্য, পুঁজিতান্ত্রিক সংকট মোকাবেলায় জাতীয়করণ নীতিকে বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের রাষ্ট্রের অন্যতম একটি নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু, জাতীয়করণকে রাষ্ট্রের মূল নীতি হিসাবে গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের একটি রাষ্ট্র দুনিয়ায় প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিল রাশিয়ার বলশেভিক পার্টি রাশিয়ায় মূলত বলশেভিক পার্টির প্রধান নেতা লেনিনের মতবাদমূলে প্রণীত কার্যত লেনিনের ১৯১৮ সালের সংবিধানমূলে। উল্লেখ্য, পুঁজিতন্ত্র পূর্ণ বিকশিত ও বয়োবৃদ্ধ তাই ক্ষয়িষ্ণু অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রকে বিলীনে কার্যকর কমিউনিজমের বিজ্ঞান আবিষ্কৃত এবং কেবলমাত্র একাকী মজুর শ্রেণীই একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রকে বিলীন করে সামাজিক মালিকানার শ্রেণীহীন ও রাষ্ট্রহীন সমাজ– কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করবে এমন তত্ত্ব, তথ্য সহ বিবৃত বিষয়গুলো জেনে–বুঝে কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্রকে রক্ষা করতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের গৃহীত কথিত জাতীয় মুক্তির রাজনৈতিক লাইন কার্যকরণে রাশিয়ায় পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতির বিকাশ ঘটাতে জারতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিক্রিয়াশীল কৃষক সহ রুশ স্যোশাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি প্রতিষ্ঠায় মূল নেতৃত্বে ছিল লেনিন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে পুঁজিতন্ত্র বিধ্বস্ত ও বিপন্ন হয়েছিল । বিপন্ন পুঁজিতন্ত্রকে রক্ষা করতে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের নেতিবাচক সুবিধা কাজে লাগিয়ে বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মূলত লেনিনের পরিকল্পনায় ১৯১৭ সালের ২৫ শে অক্টোবর, রাতের আঁধারে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে লেনিনের কর্তৃত্বাধীন সরকারের অধীনে রাশিয়ায় একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সংবিধান প্রনয়ণে একটি সংবিধান সভা গঠনের নিমিত্তে অনুষ্ঠিত সংবিধান সভার নির্বাচনে লেনিন , লেনিনের

সরকার ও লেনিনের বলশেভিক পার্টি রাশিয়ার ভোটারদের দ্বারা দারুণ ভাবে প্রত্যাখ্যত হওয়ার পর লেনিন তার রাষ্ট্রিক ক্ষমতা ছাড়তে অস্বীকৃত হয়ে বরং বলশেভিক পার্টির জন্মকালীন ঘোষণা তথা রাশিয়ায় প্রথাগত পুঁজিতন্ত্রী অর্থনৈতিক নীতি ভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক সরকারের জনসার্বভৌমত্বের রাষ্ট্র গঠনের নীতির সাথে সাংঘর্ষিক ও বিরোধী নীতির রাষ্ট্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্য রাশিয়ায় একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের বলশেভিক পার্টির জন্মগত ও লেনিনের বহুল প্রতিশ্রুত কর্মসূচি বাতিল ও অকার্যকর কার্যত অস্বীকার করে তথা জন্মের পর হতে বলশেভিক পার্টির গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিষয়ে বহুল প্রতিশ্রুতি ভংগ করে লেনিন তার ১৯১৮ সালের সংবিধান মূলে রাশিয়ায় একটি সেনা কর্তৃত্বের তবে সেনা ও রাজনৈতিক শক্তির জগা-খিচুড়ির সম্মিলনে একটি চরম স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্বের সরকারের একটি চরম স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল।

কিন্তু, হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে লেনিন তার রাষ্ট্রকে যেমন বলেছে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তেমন তার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের সামরিক ক্যুদেতাকে বলেছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যা ছিল সম্পূর্ণত মিথ্যা, ভুয়া, তবে ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সমাজ ও বিপন্ন বুর্জোয়া স্বার্থকে রক্ষা ও সংরক্ষায় দুনিয়ার মজুরদেরকে সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিষয়ে বিভ্রান্তকরণের এক হীন রাজনৈতিক প্রচেষ্টা। লেনিনের রাষ্ট্র – সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সোভিয়েতের প্রভাববলয় ভুক্ত ইউরোপের যে রাষ্ট্রগুলো নিজেদেরকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে দাবী করত সে রাষ্ট্রগুলো সহ চীন , ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া, কিউবা ইত্যাদি সহ যেসব রাষ্ট্র এখনো নিজেদেরকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে দাবী করে তারা সকলেই কেবল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র নিয়েই নয়

বরং বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রী সমাজ বিষয়েও চরম মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ ও ধূর্ত রাজনীতিক। কারণ, এ সব গুলো রাষ্ট্র হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে লেনিনবাদী রাজনীতি তথা জাতীয় মুক্তি ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের রাজনীতি মূলে গঠিত হয়েছিল।

কোনো সন্দেহ নাই, রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে ভয়ানক বাজে ধরণের পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতিরই একটি ভয়ানক মন্দ রূপ। কারণ, প্রথাগত পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্র গুলো হতে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রে শোষণের হার যেমন বেশী তেমন দমন-পীড়নের মাত্রাও বেশী। আর সেনাবাহিনী নয় কেবলমাত্র একাকী মজুর শ্রেণী হচ্ছে কমিউনিস্ট বিপ্লবী শ্রেণী। তাছাড়া, শোষক বুর্জোয়া শ্রেণী ও শোষিত মজুর শ্রেণীর চরম বিরোধ হচ্ছে কমিউনিস্ট বিপ্লব যার পরিধি স্থানীয় বা জাতীয় নয় বরং ইউনিভার্সাল আর বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রের প্রতিস্থাপনও একাকী এক দেশে সম্ভব নয় বিধায় একদেশে সমাজতন্ত্র/ কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। অতঃপর, লেনিন ও লেনিনবাদীরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, বিপ্লবের সীমা-পরিধি, তাৎপর্য -গুরুত্ব এবং প্রভাব, পুঁজিতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সমাজ , রাষ্ট্র , কমিউনিস্ট পার্টি, সেনাবাহিনী, শ্রেণী ও শ্রেণীর বিশেষত বুর্জোয়া শ্রেণী ও মজুর শ্রেণীর কার্যাদি ও দায়-দায়িত্ব এবং ভূমিকা ইত্যকার বিষয়ে কেবল মিথ্যাচারী নয় বরং প্রতারণাকারী ও ভন্ড।

উল্লেখ্য, লেনিন একজন কমিউনিস্ট ছিলেন না এটা যেমন ঠিক কিন্তু অতগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কিন্তু, বুর্জোয়া স্বার্থের রাজনৈতিক ভৃত্য লেনিন দুনিয়ার মজুরদেরকে বিভ্রান্ত করার হীন মানসে তার বুর্জোয়া রাজনীতির কদাকার চেহারাটাকে কমিউনিজমের মুখোশ দিয়ে ঢেকে রেখে নিজেকে একজন কমিউনিস্ট বলে দুনিয়ার মজুরদের নিকটও গ্রাহ্যতা পেয়েছে বলে প্রতারক, ভন্ড ও ধূর্ত লেনিন ইতিহাসে এক

গুরুত্বপূর্ণ ভিলেন হিসাবে বিবেচিত বিধায় কমিউনিস্ট আন্দোলনকারীদের নিকট প্রতারক লেনিন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনে লেনিন ও তার মতবাদ– লেনিনবাদ যা হচ্ছে কমিউনিজমের বিজ্ঞানের দূষণ তা বিকল্পহীনভাবে পরিত্যাজ্য।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের লেনিনবাদও কিন্তু কার্যত পুঁজিতন্ত্রের সংকট সমাধান করতে পারেনি বলেই সোভিয়েত ইউনিয়নের আরেক স্বৈরশাসক স্তালিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ইত্যকার রাষ্ট্রগুলোর যুদ্ধ জোট – মিত্র শক্তির সাথে জোটবদ্ধ হয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে জয়ী হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি সাধনে পুঁজিতন্ত্র বিকাশে অবিচ্ছেদ্য নীতি– উপনিবেশিকতার নীতির সমাপ্তি সাধনের মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়ায় পুঁজি ও পণ্যের অবাধ বিচরণের নিমিত্তে মুক্তবাজার অর্থনীতি বাস্তবায়নের উপযোগী পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বায়নের রাজনীতির নীতি গ্রহণে ও তা বাস্তবায়নে আই এম এফ–বিশ্ব ব্যাংক, জাতিসংঘ, আই এল ও সহ নানান বৈশ্বিক সংস্থা গঠনে যেমন অংশীদার হয়েছে তেমন লেনিন ও ট্রটস্কির কর্তৃত্বে দুনিয়াময় রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র কায়েমে প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্পূর্ণ একক কর্তৃত্বে প্রথমে তা অকার্যকর করে এবং পরবর্তীতে তৃতীয় আন্তর্জাতিককে পরিপূর্ণভাবে বিলুপ্ত করেছিল কমিউনিস্ট দাবীদার স্তালিনই।

কোনো সন্দেহ নাই, উল্লেখিত বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর আওতায় ও নিয়ন্ত্রণে জাতীয় রাষ্ট্র হচ্ছে মৃত আর জাতীয় মুক্তির রাজনীতির ধারক–বাহকদের বহুল কথিত গণতন্ত্র? অলরেডি ডেড। তাইতো পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বায়ণের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থবাহী ও স্বার্থের রক্ষক বুর্জোয়া সমাজের শাসক ক্লাবের সদস্যগণ তথা রাষ্ট্রগুলোর নির্বাহীগণ

বুর্জোয়া স্বার্থ সংরক্ষায় মজুরদেরকে দমন–পীড়নে সর্বাধিক শক্তিশালী হাতিয়ার –রাষ্ট্র এখনো দমনে–পীড়নে যোগ্য ও উপযুক্ত থাকলেও রাষ্ট্রের আয় উপার্জনে কর নীতি সহ অর্থনৈতিক নীতি, শ্রম–নীতি ইত্যাদি নীতি নির্ধারণে সরকারগুলো কার্যত স্বাধীন নয় বা প্রকৃত ক্ষমতাবান নয় । তাই, বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলো ডিফ্যাংক্ট হিসাবে টিকে থাকতে গিয়ে চরম স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে টিকে আছে।

পুঁজিতন্ত্রের বিকাশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল আবশ্যক ও সহায়ক। আবার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতির শর্ত হচ্ছে আইনানুগভাবে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতার মালিক । তাই, রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রত্যেক নাগরিক রাষ্ট্রের আইন প্রণেতা ও যেকোনো স্তরের নির্বাহী বিভাগে নির্বাচিত হওয়ার ও নির্বাচন করার সমান অধিকারী। সেই ভোটাভোটির গণতন্ত্রের জন্য মাল্টি পার্টি অর্থাৎ বহু রাজনৈতিক দল গড়ে তোলে বটে বুর্জোয়া রাজনীতিকেরা। পণ্য ও পুঁজিবাজারের প্রতিযোগীতায় লিপ্ত বুর্জোয়াদের নানান ভাগ–বিভাগে বিভক্ত নানান গোষ্ঠীর কোটারী স্বার্থ দেখ–ভালে ভোটা–ভোটি ও বহু দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্র যা সম্পত্তির পুঁজিতন্ত্রী ব্যক্তিমালিকানার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সাযুয্যপূর্ণ।

কিন্তু, লেনিনবাদী রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রে ভোটারদের ভোটতো নয়ই এমনকি লেনিন যে আমৃত্যু তার রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী ছিল সেই প্রধান নির্বাহীর পদই তার সংবিধানে বর্ণিত হয়নি। অতঃপর, সেই পদ–পদবীর ব্যক্তির ক্ষমতা–এখতিয়ার, কার্যাবলী, নির্বাচন ও পদচ্যুতি বা পদ শূন্যতার কোনো বিধানই বর্ণিত না হওয়ার ১৯১৮ সালের সংবিধান দ্বারা লেনিন যে তার রাষ্ট্র গঠন করেছিল তাতো

কেবল এক পার্টির শাসনই নয় বরং এক ব্যক্তির অলিখিত একক কর্তৃত্বের তথা সর্বাত্মক কর্তৃত্ববান ব্যক্তির রাষ্ট্র ছিল যা গণতন্ত্রের সাথেতো সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়ই এমনকি রাশিয়ার সুপ্রিম অটোক্রাট জারের রাষ্ট্রের তুলনায় অধিকতর নিকৃষ্ট মানের স্বৈরাচারী রাষ্ট্র আর সেরা কমিউনিস্ট দাবীদার লেনিনের সংবিধানটি ছিল দুনিয়ার প্রথম লিখিত আইন –বর্বর দাস সমাজের বর্বর শাসক তাই,বর্বর শিরোমনি হাম্মুরাবির জঘন্য কোডের চেয়েও জঘন্য ।

লেনিনবাদী রাষ্ট্র চীন, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কিউবা ইত্যাদিও সিংগেল পার্টির শাসনাধীন কার্যত এক ব্যক্তির শাসনাধীন এক একটা স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতন্ত্রের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বীয় শ্রেণী অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পুঁজিতন্ত্রের মূল ভিত্তি ব্যক্তিমালিকানার চরম সীমাবদ্ধতায় ও সংকটে লেনিনবাদী রাষ্ট্র গঠন করতে শরমিন্দা হয়নি বিপন্ন ও উন্মত্ত বুর্জোয়ারা।

কিন্তু, লেনিনের রাষ্ট্র টিকল কি? না। লেনিনবাদ? না। রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র? রাষ্ট্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদি সাফল্য পেত তবে সোভিয়েত ব্লকের বিলুপ্তি হত না আর চীনও এখন বাজার অর্থনীতি চালু ও বহাল রাখত না আর ভিয়েতনামও দেশী–বিদেশী পুঁজির নিশ্চয়তা বিধানে প্রাইভেট সেক্টরে বিনিয়োজিত পুঁজি বা পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তি জাতীয়করণ না করার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দিত না। অতঃপর, ব্যক্তিমালিকানার পুঁজিতন্ত্রের সংকট রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রও সমাধান করতে পারেনি বিধায় দুনিয়া ময় পুঁজিতন্ত্রের অবাধ চলাচলের উপযোগী পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বায়নের রাজনীতি ও সেমতো বিশ্ব ব্যাংক– আই এম এফ সহ নানান বৈশ্বিক সংগঠন তৈরী করেছে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ। পরাজিতরাও এখন এসব সংস্থার সদস্য। কিন্তু, আই এম এফ কি মন্দা ঠেকাতে

পেরেছে যেজন্য তা গঠিত হয়েছে? না। গত শতাব্দির ৮০'র দশকে এবং ২০০৮ হতে মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে মন্দা কার্যত এখনো বিদ্যমান। দ্বিতীয় পর্বের মন্দার কারণে মোটর গাড়ী নির্মাণে দুনিয়ার চতুর্থ বৃহৎ কোম্পানী –জেনেরেল মোটরস সহ অনেক পুঁজিতন্ত্রী প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়েছে; এবং শেয়ার মার্কেটে মারাত্মক ধ্বস নেমেছে । তাইতো, খোদ আমেরিকায় কেবল বেকারত্বের হারই বাড়ছে না বরং নৈরাজ্যও এত্তোটাই বেড়েছে যে যখন তখন স্কুলেও বন্দুকধারীরা নির্বিচারে শিশুদেরই হত্যা করছে না বরং ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট বিগত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তার হার স্বীকার করতে অস্বীকৃত হলে তার উগ্র সমর্থকরা কংগ্রেস ভবনে সন্ত্রাসী তান্ডব চালিয়ে জনজীবনে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে মার্কিনী শাসকদের অহমিকার গণতন্ত্রের কফিনেও প্যারেক মেরেছে।

আবার, ২০০৮ হতে চলে আসা মন্দার সাইড এফেক্ট হিসাবে বেশ কিছু দেশে গৃহ যুদ্ধ যেমন হয়েছে তেমন আইনী ও বে–আইনী পথে বিভিন্ন সরকারের পতন হয়েছে ; এবং হালের রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধটাও শুরু করে দুনিয়ার শাসকদের ক্লাবের বড়া বড়া মেম্বারেরা যেমন নানান জোটে ভাগ–বিভক্ত হয়ে পণ্য বাজারে যুদ্ধাস্ত্র সমেত বাজারে প্রতিযোগীতা করছে তেমন অবরোধ ইত্যাদির মতো অর্থনৈতিক অস্ত্র ব্যবহার বা তদনিমিত্তে নানান বিধি–বিধান জারী করে কেবল মুদ্রা বাজারে মার্কিনী ডলারের তেজীভাবই আনছে না বরং জ্বালানী সহ পণ্য বাজারে সংকট তৈরী করেছে বলে কোথাও কোথাও জ্বালানির দাম লিটার প্রতি একলাফে ৩০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। ফলে , পরিবহন সহ অপরাপর খাতে মূল্য বৃদ্ধির নৈরাজ্যকর অবস্থা তৈরী করেছে কেবল এক বা দুই দেশে নয় বরং

কম –বেশ সারা দুনিয়ায় এবং মুদ্রাস্ফীতির হারতো বলা চলে লাগাম মানছে না।

সুতরাং, বিশ্বায়নের রাজনীতি তথা মুক্তবাজার অর্থনীতিও পুঁজিতন্ত্রী সংকট মোকাবেলায় ব্যর্থ। তাইতো,বুর্জোয়া সমাজের অর্থনৈতিক নীতি প্রণেতা ও প্রণীত নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বুর্জোয়া অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিশালী সংস্থা– আই এম এফ বিগত শতকের ৮০ দশকে মুক্তবাজার অর্থনীতি বাস্তবায়নে ১০০% বিরাষ্ট্রীয়করণের ফতোয়া দিয়ে তখনকার মন্দা ঠেকাতে গিয়েছে আবার পরবর্তীতে অর্থাৎ গত দশকের শেষের দিক হতে বলে যাচ্ছে ৩ পি মানে পিপিপি নীতি তথা পাবলিক–প্রাইভেট পার্টনারশীপ পদ্ধতি চালু ও কার্যকর করে মন্দার কবল হতে রেহাই পেতে কিন্তু সফল হল কি? না।

অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রের সমস্যা ও সংকট মোকাবেলা করে একটি গতিশীল সমাজ হিসাবে পুঁজিতন্ত্রকে সচল রাখতে অক্ষম, অযোগ্য ও ব্যর্থ পুঁজিপতি শ্রেণী আরো বেশী বেশী মাত্রায় দাস ও সামন্ত সমাজের রাজনীতি চর্চা ও প্রসারে নিরন্তর অপচেষ্টা করছে, নানান রংয়ের রাজনীতির ফেরিওয়ালার জন্ম দিয়ে একই সাথে নানান ধরণের বৈশ্বিক সংস্থাসহ ২৩০ এর বেশী রাষ্ট্র বানিয়ে এসব রাষ্ট্র ও সংস্থা পরিচালনায় বিশাল এক পরজীবি গোষ্ঠীর জন্ম ও লালন–পালন করে পুঁজিতন্ত্রের পরিচালন ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়েও যখন সংকট হতে উত্তরণ ঘটাতে পারছে না তবু টিকে আছে বটে পুঁজিতন্ত্রকে বিলীনে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার মজুরেরা একতাবদ্ধতো নয়ই বরং দেশ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, রাজনীতি, সেক্স

ইত্যকার নানান ভাগে দুনিয়ার মজুরেরা ভাগ–বিভাগ ও বিভক্ত–বিচ্ছিন্ন বলে।

উল্লেখ্য, ব্যক্তিমালিকানার পত্তন হতে দান–অনুদানের রাজনীতি শুরু হয়েছিল। ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক সমাজ বলেই পুঁজিতন্ত্রও তা বহাল ও চালু রাখে। পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তি বিলুপ্ত হয়ে যুদ্ধের সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ থাকবে। এবং পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে একটি যুদ্ধ প্রবণ সমাজ । তাই, এখানে নানান গণবিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্রসহ বিশাল যোদ্ধাবাহিনী সহ ব্যক্তিগত সম্পত্তির হেফাজত করার জন্য পুঁজিপতি শ্রেণী নানান ধরণের স্বশস্ত্রবাহিনীও তৈরী ও লালন–পালন করছে বিশাল ব্যয়ে। তাই, পুঁজিতন্ত্রে যুদ্ধবন্দী, যুদ্ধাহত, শরণাথী সহ যুদ্ধের শিকার বা যুদ্ধবিধ্বস্ত গোষ্ঠীর সমস্যা সাময়িকভাবে সমাধানে দান –অনুদানে মোকাবেলা করতে রেড ক্রস সহ নানান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়ে তুলে বটে যুদ্ধের হিংস্রতা ও বর্বরতার বোধে আচ্ছন্ন পুঁজিপতি শ্রেণী।

আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অচল পুঁজিতন্ত্রে শোষিত ও বিক্ষুদ্ধ মজুর শ্রেণী এবং আয়–রোজগারহীন বেকার, ক্ষুধার্ত ও আধুনিক সুযোগ–সুবিধা হতে বঞ্চিত শিশু, নারী, বৃদ্ধ ইত্যকার নানান ঘরাণার তবে দুর্ভোগ ও দুদর্শার শিকার জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ–বিক্ষোভ প্রশমনের জন্য বেসরকারী পর্যায়ে নানান অলাভজনক ও অরাজনৈতিক সংস্থার ঘোষণামূলে নানান স্বেচ্ছাসেবী তথা বেসরকারী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা গড়ে তুলছে বটে সংক্ষুব্দদের যাবতীয় দুর্ভোগের জন্য দায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীই। এসকল সংস্থা দারিদ্র দূরীকরণ, কর্ম সংস্থান , পরিবেশ, স্বাস্থ্য , শিক্ষা ইত্যকার বিষয়ে তথাকথিত জনসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রসারের নিমিত্তে শিক্ষা –প্রতিষ্ঠান সহ নানান বিধি–ব্যবস্থা, শ্রম–অধিকার , মানবাধিকার, শিশু অধিকার, নারী অধিকার ইত্যকার

বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করা সহ পণ্য উৎপাদন, বিপনন, ব্যাংকিং, যোগাযোগ- পরিবহণ, বনায়ন, গবেষণা ইত্যকার নানান প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে ও পরিচালনা করছে বটে পুঁজিপতিদের তথা সম্পত্তিবানদের দান-অনুদানের অর্থে। তবে কথিত জনকল্যাণে নিবেদিত উন্নয়ন সহযোগী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মহান কর্মী রূপ মাদকতায় আচ্ছন্ন করে সেসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারীদের প্রথাগত মজুরি ও বেতন –ভাতা বা সুযোগ -সুবিধাদি কম দিয়ে তবে কাজটা বেশী করানোর কোনো সুযোগ হাতছাড়া করে না বটে এনজিও লর্ডরা।

পুঁজির মালিকেরা পুঁজির ভার বহনে অক্ষমতা নিশ্চিত করেই তবে সংক্ষুব্দ মজুরদের পুঁজিতন্ত্রী বিরোধী কার্যক্রম হতে দৃষ্টি সরিয়ে এসব বেসরকারী কার্যক্রমের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রের কিছুটা সংস্কার করে মজুর শ্রেণী সহ পুঁজিতন্ত্রে ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষোভ-বিক্ষোভকে কিছুটা হলেও প্রশমিত করে মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রকে সংরক্ষার অপচেষ্টা করে যাচ্ছে বটে ভয়ানক চতুর ও ধূর্ত্য পুঁজিপতি শ্রেণী। এমনকি, বিশ্বের ধনীদের মধ্যকার প্রথম কাতারের প্রথম দিকে থাকা বিলিনিয়াররাওতো এসব তথাকথিত উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানে দান-অনুদান দিচ্ছেই উপরন্ত, তাদের কেহ কেহ নিজ ব্যবসার বিশাল পরিমাণ অর্থ এরকম কথিত অলাভজনক ও অরাজনৈতিক সংগঠনে স্থানান্তর করে নিজ নিজ মালিকানাধীন পুঁজির বিনিয়োগ ঝুঁকি কমাতে ও চাপ হতে কিছুটা নিস্কৃতি পেতে কেহ কেহ সেই সব প্রতিষ্ঠানে নিজেই কাজ করে কথিত বিশ্ব মানব কল্যাণে কাজ করার মহত্ব দেখানোর চেষ্টা করে মজুর শ্রেণীকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করছে। তবে, পুঁজিতন্ত্রকে রক্ষা করতে যত লেবাসই শোষক পুঁজিপতিরা

পরুক না কেন তাদের এরূপ কাজের মাধ্যমেও তারা কিন্তু নিশ্চিত করছে যে ব্যক্তিমালিকানা আসলেই অকার্যকর তাই বাতিলযোগ্য।

সন্দেহ নাই, ব্যক্তিমালিকানামূলী পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের শর্তে এবং ব্যক্তিপুঁজিপতির সীমাবদ্ধতা অতিক্রমে পুঁজিপতি শ্রেণী ব্যাংকিং, ক্রেডিট ব্যবস্থা, ,শেয়ার মার্কেট, সমবায় মালিকানা, বড় বড় কোম্পানী ও মাল্টি–ন্যাশনাল কোম্পানী ইত্যাদি গড়ে তুলে কার্যত সামাজিক মালিকানার প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকতা যেমন নিশ্চিত করেছে তেমন কথিত অরাজনৈতিক ও অলাভজনক তবে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো গড়ে তোলেও অন্যায়, অযৌক্তিক ও অন্যায্য ব্যক্তিমালিকানার সীমাবদ্ধতা, অপ্রয়োজনীয়তা ও অনাবশ্যকতাও নিশ্চিত করে ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রের পতন ও কমিউনিজমের উত্থানের শর্তাদি নিশ্চিত করে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটিকেই সামনে হাজির করেছে বটে পুঁজিপতিরাই।

তবু, ইতিহাস অস্বীকার ও অবজ্ঞাকারী চরম প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী নিজের উত্থানের ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করে কেবলই টিকে থাকতে হালে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ধারণা সামনে এনে মজুরদেরকে তাদের মুক্তি বিষয়ে বিভ্রান্ত করতে বিনা মূল্যে চিকিৎসা, শিক্ষাভাতা, বেকার ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা ইত্যকার নানান ভাতাদি রাষ্ট্র হতে প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তেমন শিক্ষা– স্বাস্থ্য খাত সহ নানান খাতে ভর্তুকি প্রদানের বিহীত করছে। ছিন্নমূল বা বসতিহীনদেরকে বিনা মূল্যে তবে সরকারী খরচে আবাসন সুবিধা দিচ্ছে। যে রাষ্ট্র এসব কথিত জনকল্যাণ মূলক কাজ করছে সে রাষ্ট্রকে বুর্জোয়ারা বলেছে কল্যাণ মূলক রাষ্ট্র। কিন্তু, এসব খাত সহ রাষ্ট্রীয় সকল খরচ নির্বাহের জন্য রাষ্ট্রকে তথা রাষ্ট্রের নির্বাহী

বিভাগকে যে আয় করতে হয় তাতো মজুরদের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের অংশ বিশেষ হতে বৈ আর কিছু হতে নয়। কারণ, ব্যয় করার জন্য নানান ধরণের ট্যাক্স-ট্যারিফ তথা রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে রাষ্ট্র আয় করে বটে। কিন্তু, মজুরেরা পণ্য উৎপন্ন করে বলেই পুঁজিতন্ত্রে মূল্য অতঃপর, উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হয় আর উদ্বৃত্ত-মূল্য নিজেদের মধ্যে হিস্যা মতো নিয়ে ভোগ-ব্যবহার করে বটে পুঁজিপতি শ্রেণী তবে, নিজেদের ইচ্ছেমতো নয় বরং পুঁজিপতি শ্রেণীর সংশ্লিষ্ট পক্ষ নিজ নিজ হিস্যা পায় বটে বাজারের নিয়মে। আর পুঁজিতন্ত্রী পদ্ধতির ব্যবস্থাপকগণের কর্তৃত্বে পুঁজিতন্ত্রের রক্ষণা-বেক্ষণে ক্রিয়াশীল রাষ্ট্রের খরচতো সেই উদ্বৃত্ত-মূল্য হতেই দিয়ে থাকে বটে অন্যায়ভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্যভোগী পুঁজিপতিরা যারা পণ্য উৎপন্ন করে না তাই মূল্য অতঃপর, উদ্বৃত্ত-মূল্যও উৎপন্ন করে না। অতঃপর, দৃশ্যত, সরাসরি করদাতা হিসাবে প্রধানত পুঁজিপতিরাই রাষ্ট্রের খরচ দেয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র তা হোক প্রথাগত পুঁজিতন্ত্রী বা রাষ্ট্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক বা তথাকথিত কল্যাণ রাষ্ট্র এসকল রাষ্ট্রের দান-অনুদান, ঋণ ও উন্নয়নমূলক খাত বা রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যয় সহ তাবৎ ব্যয়ের যোগান দিচ্ছে বটে রাষ্ট্রের দমন-পীড়নের শিকার শোষিত মজুর শ্রেণী। কারণ, মজুর শ্রেণীতো পণ্য উৎপাদন করে উৎপন্ন করে মূল্য অতঃপর, উদ্বৃত্ত-মূল্য আর মজুরদের উদ্বৃত্ত-মূল্য হতে রাষ্ট্রও একটা অংশ হিস্যা হিসাবে লাভ করে পুঁজিতন্ত্রী পদ্ধতিকে ম্যানেজ ও রক্ষা করে পুঁজিপতি শ্রেণীর পুঁজিতান্ত্রিক স্বার্থে।

উল্লেখ্য, দুনিয়ার মোট জিডিপি'র প্রায় ৩০%রাষ্ট্রের ব্যয়ের জন্য ব্যয় করছে পুঁজিপতি শ্রেণী।

শাসক পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বায়নের রাজনীতি চর্চা করার কারণে রাষ্ট্র ডিফাংক্ট হলেও পুঁজিতন্ত্রী সমাজের সকল রাষ্ট্রই পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণে তথা পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতি সংরক্ষায় পুঁজিপতি শ্রেণীর সর্বাধিক শক্তিশালী দমন–পীড়নমূলক হাতিয়ার বৈ কিছু নয়। করল্লা যেমন মিষ্টি হয় না তেমন রাষ্ট্রও কল্যাণমূলক হয় না ঠিক যেমন কয়লা ধূইলে ময়লা যায় না তেমন যতোই কল্যাণমূলক হিসাবে রাষ্ট্রকে উপস্থাপন করা হোক না কেন রাষ্ট্র কিন্তু জন্ম সূত্রে ও জন্ম শর্তে এবং কর্ম মূলে শোষক–শাসক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষায় পরজীবী শ্রেণীর সর্বাধিক শক্তিশালী দমন–পীড়নের একটি শ্রেণী হাতিয়ার। রাষ্ট্রের জন্ম শর্ত ও রাষ্ট্রের কার্যাদিকে গোপন ও আড়াল করতে লেনিন ও লেনিনবাদীরা তথাকথিত শোষণহীন রাষ্ট্রের উদ্ভট তত্ত্ব বানোয়াটি মূলে হাজির করেছিল। কিন্তু, ইতিহাস প্রমাণ করেছে লেনিনবাদীরা এমনকি রাষ্ট্র বিষয়ে মিথ্যাবাদী।

তবু, এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ তথাকথিত কল্যাণ রাষ্ট্রের ভূয়া–বানোয়াটি তত্ত্ব ভিত্তিক তবে মজুরদের জন্য ক্ষতিকর রাজনীতি হাজির করে কৈ মাছের তেলে কৈ ভাজার নীতি গ্রহণ করে পুঁজিতন্ত্রের মরণাপন্ন অবস্থার কারণে ডিফাংক্ট হওয়া রাষ্ট্রকে রক্ষায় অপতৎপরতা চালাচ্ছে।

অতঃপর, উপরোক্ত বিবরণ হতে এটি নিশ্চিত হয় যে পুঁজির অস্তিত্বের শর্তদ্বয়ে এবং পুঁজিপতি শ্রেণী টিকে থাকার শর্তে পুঁজিতন্ত্রে পুঁজিপতি শ্রেণী স্বীয় সংকীর্ণ স্বার্থে অন্ধের মতো যে সব কাজ করেছে সেসব কাজের কারণেই পুঁজিতন্ত্র নিশ্চিত বিলুপ্তির শর্তাদি ও ভিত্তি তৈরী করে অসংখ্য স্ববিরোধীতায় পরিপূর্ণ ও সংকটাপন্ন।তাই,মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্র বিলুপ্ত হবেই পুঁজিতন্ত্রে বিদ্যমান সকল স্ববিরোধীতায় সৃষ্ট সকল

সমস্যা ও সংকটের যৌক্তিক সমাধান হিসাবে সামাজিক মালিকানার কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং শোষক –শাসক পুঁজিপতি শ্রেণী সমেত পুঁজিতন্ত্রকে কবরস্ত করবে বটে খোদ পুঁজিপতি শ্রেণীর সৃষ্ট পণ্য তথা পুঁজি উৎপন্নকারী শোষিত ও শাসিত মজুর শ্রেণী ।

সুতরাং, পুঁজিতন্ত্রের সৃষ্ট উৎপাদনের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নততর প্রযুক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারের উপযোগী ও উপযুক্ত সামাজিক মালিকানার– কমিউনিজম হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রের শেষ ও চূড়ান্ত গন্তব্য। কাজেই, বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রই হচ্ছে ইতিহাসের শেষ ও চূড়ান্ত শোষণমূলক ও শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ফলে, শেষ রাজনৈতিক সমাজ তাই অমানবিক সমাজও।

অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রেই সৃষ্টি হয়েছে কমিউনিজমের যাবতীয় শর্ত ও ভিত্তি। তাই, স্ববিরোধী পুঁজিতন্ত্রে সৃষ্ট পুঁজিতন্ত্র বিরোধী ও বিনাশী শর্তসমূহ পূরণের শর্তে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্র বিলীন হওয়ার মাধ্যমে পুঁজিপতি শ্রেণী বিলুপ্ত হওয়ার জন্য কমিউনিস্ট বিপ্লবী মজুর শ্রেণী নয় বরং প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণীই দায়ী। কার্যত, স্বীয় শ্রেণী অস্তিত্ব রক্ষায় অক্ষম ও অযোগ্য পুঁজিপতি শ্রেণী ইতিহাসকে অস্বীকার করে পুঁজিতন্ত্রকে রক্ষা করতে এযাবৎ যেসব কার্যাদি করেছে যা সংক্ষেপে তাবৎ ঘটনাবলীর নির্যাস হিসাবে উপরে বিবৃত হয়েছে এবং পুঁজিরই শর্তে পুঁজিপতি শ্রেণী সেসব ক্রিয়াদি করেছে বলেই পুঁজিতন্ত্র স্বীয় সংকট হতে উত্তরিত না হয়ে ক্রমাগত আরো সংকটে পড়েছে। আসলে, পুঁজির সংকট কমাতে গিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণী যেসব পন্থা অবলম্বন করছে তাতে পুঁজিপতি শ্রেণী নিজের ও পুঁজিতন্ত্রের সংকটকে ক্রমাগত আরো বাড়িয়ে পুঁজিতন্ত্রের ধ্বংসের ইভেন্ট– একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব চাপিয়ে দিচ্ছে

বটে এই বিপ্লবের একমাত্র এ্যাক্টর– মজুর শ্রেণীর উপর। কাজেই, চরম প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণীর চাপিয়ে দেওয়া কমিউনিস্ট বিপ্লবে পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণী ইতিহাসের অংশ হবে আর বিজয়ী মজুর শ্রেণী হবে ইতিহাসের রচয়িতা এটাও কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের ভবিতব্য ও অমোঘ বিধান। কিন্তু, উক্ত বিজয়ের ইতিহাস রচনার প্রথম শর্ত– দুনিয়ার মজুরদের একতা আর একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার মজুরদের একতা গড়তে একটি অন্যতম শর্ত বটে মজুরদের একটি পার্টি যা কেবল মজুরদেরই একটি পার্টি অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী হাতিয়ার তবে রাজনৈতিক দলতো নয়ই বরং রাজনীতির সমাপ্তিতে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু মজুরদের দ্বারা অর্জিত কমিউনিজমে উপযোগীতাহীন বিধায় মজুরদের পার্টি– কমিউনিস্ট পার্টিও টিকে থাকার যৌক্তিকতা হারিয়ে বিলুপ্ত হবে ।

সন্দেহ নাই, পুঁজিতন্ত্রই সেই পার্টি অর্থাৎ মজুরদের পার্টি গড়ে উঠার শর্তাদি তৈরী করছে বটে নেতিবাচকভাবে যদিচ, পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণী কমিউনিস্ট লীগ ও প্রথম আন্তর্জাতিককে বিলুপ্ত করতে পেরেছে বা সমাজতন্ত্রের আবরণে লেনিনবাদী রাজনীতি দ্বারা মজুরদেরকে বিভ্রান্ত করতে পেরেছে এবং সাময়িকভাবে হলেও সফল হয়েছে তারা কমিউনিজমের বিজ্ঞানকে আড়াল ও বিকৃত করতে। কিন্তু, এগুলোই যে মজুর শ্রেণীর নিকট ইতিহাস হিসাবে হাজির হচ্ছে। অতঃপর, পুঁজির সংকট, পুঁজিপতি শ্রেণীর সংকট এবং মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রের মহাসংকট এবং উল্লেখিত তাবৎ সংকটে ও পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণে নিত্য দুর্ভোগ ও দুর্দশায় ভোগা এবং পুঁজির শৃংখলে আবদ্ধ মজুর শ্রেণী স্বীয় শ্রেণী মুক্তির নিমিত্তে যেমন পুঁজিতন্ত্রের কঠিন–কঠোর বাস্তবতাকে জেনে–বুঝে এবং ইতিহাসকে বিবেচনা করবে তেমন এই শ্রেণীটি তার ইতিহাস নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে একটি কমিউনিস্ট

বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্রকে বিলীন ও অদৃশ্য করবে চিরতরে।

অতঃপর, মজুর শ্রেণীর মধ্যকার প্রাগ্রসর বা শ্রেণী সচেতন অংশ স্বীয় শ্রেণীকে একটি শ্রেণী সচেতন শ্রেণী হিসাবে গঠন করে সংগঠিত মজুর শ্রেণীকে ইতিহাসের রচয়িতা হিসাবে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার মজুরদেরকে একতাবদ্ধ করতে মজুরদের একটি পার্টি গড়ে তুলবে স্বীয় শ্রেণী মুক্তির সাথে পুরো সমাজকে মুক্ত করার ঐতিহাসিক দায় ও তাগিদে। তাই, একটা কমিউনিস্ট পার্টি ও একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব যেমন পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্রের সংকট ও সমস্যার সমাধান ও উত্তরণের হেতুবাদে আবশ্যক ও অনিবার্য তেমন কমিউনিজমও হচ্ছে অপরিহারযোগ্য।

অতঃপর, স্ববিরোধী পুঁজিতন্ত্রে পুঁজিতন্ত্র বিরোধী যেসব শর্ত তৈরী হয়েছে তা পূরণে এবং একই হেতুবাদে পুঁজিতন্ত্রী বিরোধী ও পুঁজি বিনাশে তথা সমতার সমাজের নীতিগুচ্ছের ভিত্তি হিসাবে কমিউনিজমের বিজ্ঞান সহ যে সব নীতি উদ্ভূত ও সূত্রায়িত হয়েছে সেসব নীতির সফল বাস্তবায়ন ও রূপায়নের উপযুক্ত সমাজ হচ্ছে কমিউনিজম। তাইতো , স্ববিরোধীতা ও শ্রেণী বৈরীতার পুঁজিতন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিণতিই হচ্ছে কমিউনিজম। সুতরাং, পুঁজিতন্ত্রে সৃষ্ট স্ববিরোধীতায় পুঁজিতন্ত্রের পতন ও কমিউনিজমের বিজয় হচ্ছে সমান অনিবার্য ও অপরিহারযোগ্য।

শাহ্ আলম,
সদস্য– আই সি ডব্লিউ এফ।
ঢাকাঃ ২৯, জুলাই, ২০২২ খ্রীঃ ।
মোবাইলঃ ৮৮+ ০১৭১– ৫৩৪৫–০০৬।

www,icwfreedom.org
Emancipation-ICWF, a you tube Channel.